Peace কুরআন-হাদীসের আলোকে

যাদুটোনা ঝাড়ফুঁক জ্বীনের আছর তাবিজতুমার

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

যাদু টোনা
ঝাড় ফুঁক
জ্বীনের আছর
তাবীজ কবচ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

যাদু টোনা ঝাড় ফুঁক জ্বীনের আছর তাবীজ কবচ

মূল

শায়খ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মো: রফিকুল ইসলাম

মো: নূরুল ইসলাম মণি

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

যাদু টোনা
ঝাড় ফুঁক
জ্বীনের আছর
তাবীজ কবচ

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

ফোন : ৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুলাই – ২০১২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : বাকো প্রেস

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

ISBN : 978-984-8885-11-6

মুখবন্ধ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

"হে আল্লাহ তাদের ঘাড়ের ষড়যন্ত্রে উপর তোমাকে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছি"

জ্বীনের আছর, তাবীজ কবজ, ঝাড় ফুঁক ও যাদু টোনা নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি اَلْحَمْدُلِلّٰهِ-এর সাথে সাথে তার নিকট জ্বীন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মানুষ যেমন আল্লাহর সৃষ্টি তদ্রূপ জ্বীনও আল্লাহর সৃষ্টি। জ্বীনসহ সকল সৃষ্টিই মানবের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো দুষ্ট জ্বীনরা মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। তাই এই দুষ্ট জ্বীনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা জানা সবার জন্য আবশ্যক। ঝাড়ফুক যদি ইসলাম সম্মত হয় তাহলে এটা জায়েয, তাবীজ কবজ ও যাদু টোনা ইসলামে জায়েজ নেই। রাসূল ﷺ-এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা তাবীজ না ব্যবহার করার জন্য। তিনি এরশাদ করেছেন مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করল সে শিরক করল। তাই জ্বীনের আছর, তাবীজ কবজ, ঝাড় ফুঁক ও যাদু টোনো এ চারটি বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা তুলে ধরতে আমরা চেষ্টা করেছি। আমাদের গবেষণায় ত্রুটি হতে পারে, তাই বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অস্পষ্ট নয়।

মানুষের শিরক মিশ্রিত আমলের কারণে দুষ্ট জ্বীন দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানুষ যদি পরিপূর্ণ তাওহীদবাদী হয়ে আমল করত তাহলে দুষ্ট জ্বীনেরা মানুষের উপর প্রভাব ফেলতে পারত না।

মূল্যবান এ গ্রন্থটি থেকে পাঠকগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে যারা সময়, শ্রম ও মেধা কুরবানী করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

সূচিপত্র

১. জ্বীনের আছর

২. তাবীজ কবচ

৩. ঝাড় ফুঁক

৪. যাদু টোনা

(১)

জ্বীনের আছর ও তার প্রতিকার

মূল

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদনায়

আবু শুআইব মুহাম্মদ সিদ্দিক

১. জ্বীনের আছর ও তার প্রতিকার

১. জ্বীনের পরিচয়

জ্বীন জাতি আল্লাহ তায়ালার একটি সৃষ্টি। যেমন তিনি ফেরেশতা, মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি সৃষ্টি করেছেন জ্বীন। মানুষের মতো তাদেরও বিবেক, বুদ্ধি, অনুভূতিশক্তি রয়েছে। তাদের আছে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা। তাদের মধ্যে রয়েছে ভালো জ্বীন ও মন্দ জ্বীন। আল কুরআনে বহু জায়গায় জ্বীনদের কথা বর্ণনা করা :

وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ـ

আর নিশ্চয় আমাদের কতিপয় সৎকর্মশীল এবং কতিপয় এর ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত। (সূরা আল জ্বীন : আয়াত-১১)

এ জাতির নাম জ্বীন রাখা হয়েছে, কারণ জ্বীন শব্দের অর্থ গোপন। আরবী জ্বীন শব্দ থেকে ইজতিনান এর অর্থ হলো ইসতেতার বা গোপন হওয়া। যেমন আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ـ

অতঃপর যখন রাত তার উপর আচ্ছন্ন হলো। (সূরা আল আনআম : আয়াত-৭৬)

এখানে জান্না অর্থ হলো, আচ্ছন্ন হওয়া, ঢেকে যাওয়া, গোপন হওয়া।

তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে বলেই তাদের নাম রাখা হয়েছে জ্বীন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ـ

নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। (সূরা আল আরাফ : আয়াত-২৭)

জ্বীনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন–

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ ـ

আর ইতোপূর্বে জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।

(সূরা-হিজর : আয়াত-২৭)

এ আয়াত দ্বারা আমরা আরো জানতে পারলাম যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে জ্বীন জাতি সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُوْنٍ ـ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ ـ

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। আর এর পূর্বে জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।

(সূরা-হিজর : আয়াত-২৬-২৭)

আল্লাহ্ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে-ই উদ্দেশ্যে জ্বীনকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

আর আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। (সূরা আয যারিয়াত : আয়াত-৫৬)

জ্বীনদের কাছেও তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِى وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَا الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِيْنَ ـ

হে জ্বীন ও মানুষের দল! তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করেননি, যারা তোমাদের বিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তারা বলবে, আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিল কাফির । (সূরা আল আনআম : আয়াত-১৩০)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, বিচার দিবসে মানুষের যেমন বিচার হবে তেমনি জ্বীন জাতিকেও বিচার ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

তারা বিবিধ রূপ ধারণ করতে পারে বলে হাদীসে এসেছে। এমনিভাবে দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে বলে আল কুআনের সূরা আন নামলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসমানী কিতাবে যারা বিশ্বাসী-ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমান তারা সকলে জ্বীনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তারা কেউ জ্বীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। পৌত্তলিক, কতিপয় দার্শনিক, বস্তুবাদী গবেষকরা জ্বীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। দার্শনিকদের একটি দল বলে থাকে, ফেরেশতা ও জ্বীন রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুন্দর চরিত্রকে ফেরেশতা আর খারাপ চরিত্রকে জ্বীন বা শয়তান শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়। অবশ্য তাদের এ বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২. জ্বীনের শ্রেণীভেদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন–

اَلْجِنُّ ثَلَاثَةُ اَصْنَافٌ : صِنْفٌ يَطِيْرُ فِى الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَاتٌ وَكِلَابٌ، وَصِنْفٌ يَحُلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ ـ

জ্বীন তিন প্রকার–

১. যারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়।

২. কিছু সাপ ও কুকুর।

৩. মানুষের কাছে আসে ও চলে যায়।

(সূত্র ঃ তাবারানী। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন : সহীহ আল জামে আস সাগীর, হাদীস নং ৩১১৪, আবু সালাবা আল খাশানী (রা) থেকে বর্ণিত।) (মুজামু আলফাজ আল-আকীদাহ)

জ্বীন বিভিন্ন প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু তাদের একটি গ্রুপ সর্বদা সাপ ও কুকুরের বেশ ধারণ করে চলাফেরা করে মানব সমাজে। এটা তাদের স্থায়ী রূপ।

৩. জ্বীনের অস্তিত্বে বিশ্বাস ঈমানের দাবি

একজন মুসলিমকে অবশ্যই জ্বীনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। যদি সে জ্বীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিন থাকবে না। জ্বীনের অস্তিত্ব স্বীকার ঈমান বিল গাইবা বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে প্রায় পঞ্চাশ বার জীনের আলোচনা করেছেন। জ্বীন জাতির সৃষ্টি, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাদের ইসলাম গ্রহণ, মানুষের পূর্বে তাদের সৃষ্টি করা, ইবলীস জ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আর রাহমানে জ্বীন ও মানুষকে এক সাথে সম্বোধন, নবী সুলাইমান আলাহিস সালাম এর আমলে জ্বীনদের কাজ-কর্ম করা, তাদের মধ্যে রাজমিস্ত্রী ও ডুবুরী থাকার কথা, তাদের রোজ হাশরে বিচার, শাস্তি ও পুরস্কারের সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি বহু তথ্য আল কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উল্লেখ করেছেন। তাদের সম্পর্কে বলতে যেয়ে সূরা আল-জ্বীন নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। তাই কোন মুসলমান জ্বীনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করার মতো কাজ করতে পারে না। তেমনি জ্বীনকে রূপক অর্থে ব্যবহার করার কথাও ভাবতে পারে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা এটাই। বিভ্রান্ত ও বিলুপ্ত মুতাযিলা ও জাহমিয়্যা সম্প্রদায় জ্বীনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

৪. জ্বীন কি মানুষকে আছর করে?

এর উত্তর হলো, অবশ্যই জ্বীন মানুষকে আছর করতে পারে। স্পর্শ দ্বারা পাগল করতে পারে। মানুষের উপর ভর করতে পারে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার জীবনের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ব্যাহত করতে পারে।

এটা বিশ্বাস করতে হয়। তবে এ বিষয়টি কেহ্ অবিশ্বাস করলে তাকে কাফের বলা যাবে না। সে ভুল করেছে, এটা বলা হবে।

জ্বীন যে মানুষকে আছর করে তার কিছু প্রমাণ
আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ۔

যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় দাড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৭৫)

এ আয়াত দ্বারা যে সকল বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝা যায়–

১. যারা সূদ খায় তাদের শাস্তির ধরন সম্পর্কে ধারণা।

২. শয়তান বা জ্বীন মানুষকে স্পর্শ দ্বারা পাগলের মতো করতে পারে।

৩. মানুষের উপর শয়তান বা জ্বীনের স্পর্শ একটি সত্য বিষয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

৪. জ্বীন-শয়তানের এ স্পর্শ দ্বারা মানুষ যেমন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি শারীরিক দিক দিয়েও অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ـ

আর যে পরম করুণাময়ের জিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।

(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৬)

এ আয়াত দ্বারা যা স্পষ্ট হলো– মহান আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে বিরত থাকা, জ্বীন বা শয়তানের স্পর্শ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটি কারণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ـ

আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে কষ্ট ও আযাবের ছোঁয়া দিয়েছে। (সূরা সাদ : আয়াত-৪১)

এ আয়াত দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝলাম–

১. শয়তান নবী আইউব আলাহিস সালামকে স্পর্শ করে শারীরিক রোগ-কষ্ট বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

২. তিনি শয়তানের স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়। (সূরা আল আরাফ : আয়াত-২০১)

এ আয়াত থেকে যা বুঝে আসে তা হলো–

১. যারা মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু তাদেরকেও জ্বীন বা শয়তান স্পর্শ করতে পারে। তারা মুত্তাকী হয়েও জ্বীন বা শয়তানের আছরে নিপতিত হতে পারে।

২. যারা মুত্তাকী তাদের শয়তান বা জ্বীন স্পর্শ করলে তারা আল্লাহকেই স্মরণ করে। অন্য কোন কিছুর দ্বারস্থ হয় না।

৩. মুত্তাকীগণ জ্বীন বা শয়তান দ্বারা স্পর্শ হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করলে তাদের সত্যিকার দৃষ্টি খুলে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহ আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা আল আরাফ : আয়াত-২০০)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও জ্বীন-শয়তান আছর করতে পারে।

২. জ্বীন আছর করলে বা শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. সূরা আল ফালাক ও সূরা আন-নাস হলো জ্বীন শয়তানকে আছর থেকে আশ্রয় প্রার্থনার অতি মূল্যমান বাক্য। এ আয়াতের তাফসীর দ্বারা এটা প্রমাণিত। হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرِىَ الدَّمِ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই শয়তান মানুষের রক্তের শিরা-উপশিরায় চলতে সক্ষম। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন–

إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ.

গত রাতে একটি শক্তিশালী জ্বীন আমার উপর চড়াও হতে চেয়েছিল। তার উদ্দেশ্যে ছিল আমার সালাত নষ্ট করা। আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে শক্তি দিলেন। (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নাসায়ীর বর্ণনায় আরো এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তাকে ধরে ফেললাম। আছাড় দিলাম ও গলা চেপে ধরলাম। এমনকি তার মুখের আর্দ্রতা আমার হাতে অনুভব করলাম।

এ হাদীস থেকে আমরা যা জানতে পারলাম–

১. জ্বীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও আছর করতে চেয়েছিল।

২. জ্বীনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায নষ্ট করার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল।

৩. ইফরীত শব্দের বাংলা অর্থ হলো ভূত। জ্বীনদের মধ্যে যারা দুষ্ট ও মাস্তান প্রকৃতির তাদের ইফরীত বলা হয়।

৪. জ্বীন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ভয় পাননি। তিনি তার সাথে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করেছেন।

৫. জ্বীনদের শরীর বা কাঠামো আছে যদিও তা সাধারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

৫. জ্বীন ও ভূতের মধ্যে পার্থক্য

জ্বীন আরবী শব্দ। বাংলাতেও জ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভূত বাংলা শব্দ। এর আরবী হলো ইফরীত, বহুবচনে আফারীত। আল কুরআনে সূরা আন-নামলের ৩৯ নং আয়াতে ইফরীত কথাটি এসেছে এভাবে–

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ.

এক শক্তিশালী জ্বীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।

এ আয়াতে ইফরীতুম মিনাল জ্বীন অর্থাৎ জ্বীনদের মধ্যে থেকে এক ইফরীত বা ভূত .. কথাটি এসেছে। এমনিভাবে উপরে বর্ণিত হাদীসেও ইফরীতুম মিনাল জ্বীন কথাটি এসেছে। তাফসীরবিদগণ বলেছেন, জ্বীনদের মধ্যে যারা অবাধ্য, বেহায়া, মাস্তান, দুষ্ট প্রকৃতির ও শক্তিশালী হয়ে থাকে তাদের ইফরীত বলা হয়। (আল মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন)।

ইফরীত শব্দের অর্থ বাংলাতে ভূত।

অতএব দেখা গেল, ইফরীত বা ভূত, জ্বীন ছাড়া আর কিছু নয়। সব ভূতই জ্বীন তবে সব জ্বীন কিন্তু ভূত নয়।

৬. মানসিক রোগী আর জ্বীনেধরা রোগীর মধ্যে পার্থক্য

অনেক সময় আমরা এ সমস্যায় পড়ে যাই। ঠিক করতে পারি না রোগটা মানসিক না-কি পাগল, না কি জ্বীনের আছর থেকে রোগ দেখা দিয়েছে। অনেক সময় তা আমরা মানসিক-রোগীকে জ্বীনে-ধরা রোগী বলে থাকি। তেমনি জ্বীনে-ধরা রোগীকে মানসিক রোগী বলে চালাতে চেষ্টা করি। বিশেষ করে ডাক্তার ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা কোনভাবেই জ্বীনের আছরকে স্বীকার করতে চান না। তারা এ জাতীয় সকল রোগীকে মানসিক রোগী বলে সনাক্ত করে থাকেন।

পাগলামীকে আরবীতে বলা হয় জুনুন। আর পাগল-কে বলা হয় মাজনূন। আরবীতে এ জুনুন ও মাজনূন শব্দ দুটি কিন্তু জ্বীন শব্দ থেকে এসেছে।

যেমন আল কুরআনে এসেছে –

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ -

সে কেবল এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

এ কথাটি নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোকেরা তার সম্পর্কে বলেছিল। এ আয়াতে জ্বীন্নাতুন শব্দের অর্থ হল পাগলামী।

কাজেই কাউকে পাগলামীর মতো অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখলে সেটা যেমন জ্বীনের আছরের কারণে হতে পারে, আবার তা মানসিক রোগের কারণেও

হতে পারে। তবে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বিষয় নির্ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে মানসিক রোগী জ্বীনে-ধরা রোগীর মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

এগুলো হলো–

১. জ্বীনে-ধরা রোগী কিছুক্ষণের জন্য বেঁহুশ হয়ে যায়। মানসিক রোগী বেঁহুশ হয়ে পড়ে না।

২. কখনো কখনো জ্বীনে-ধরা রোগীর মুখ থেকে ফেনা বের হয়। দাতে খিল লেগে যায়। মানসিক রোগীর মুখ থেকে ফেনা বের হয় না।

৩. জ্বীনে ধরা রোগী প্রায়ই স্বপ্নে সাপ, কুকুর, বিচ্ছু, বানর, শিয়াল, ইঁদুর ইত্যাদি দেখে থাকে। কখনো কখনো স্বপ্নে দেখে সে অনেক উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে।

৪. জ্বীনে ধরা রোগীর সর্বদা ভীতু ভীতু ভাব থাকে। সর্বদা তার ভয় লাগে। মানসিক রোগীর তেমন ভয় থাকে না।

৫. জ্বীনে ধরা রোগী নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর যিকির ইত্যাদি পছন্দ করে না। বরং এগুলো তার অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়।

৬. জ্বীনে ধরা রোগী কখনো কখনো ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন ভঙ্গিতে কথা বলে।

৭. জ্বীনে ধরা রোগী অধিকাংশ সময় স্বাভাবিক থাকে। মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

৮. জ্বীনে-ধরা রোগী থেকে অনেক সময় আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন অল্প সময়ে সে বহু দূরে চলে যায়। গাছে উঠে সরু ডালে বসে থাকে ইত্যাদি।

৯. জ্বীনে ধরা রোগীর কাছে স্বামী, ঘর-সংসার, স্ত্রী-সন্তানদের ভালো লাগে না।

১০. জ্বীনে ধরা রোগীর উপর যখন জ্বীন চড়াও হয় তখন ক্যামেরা দিয়ে তার তো ছবি তুললে ছবি ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট হয়। স্পষ্ট হয় না, দেখা গেছে আশে পাশে সকলের ছবি স্পষ্টভাবে উঠেছে কিন্তু রোগীর ছবিটি ধোয়াচ্ছন্ন। এটা কারো কারো নিজস্ব অভিজ্ঞতা। মনে রাখতে হবে অভিজ্ঞতা সর্বদা এ রকম ফলাফল নাও দিতে পারে।

কিন্তু বড় সমস্যা হবে তখন, যখন রোগীটি নিজেকে জ্বীনে ধরা বলে অভিনয় করে কিন্তু তাকে জ্বীনেও আছর করেনি আর সে মানসিক রোগীও নয়। সে তার নিজস্ব একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য জ্বীনে ধরার অভিনয় করছে। এ অবস্থায়

অভিভাবকের করণীয় হলো, তারা তাকে তার দাবি পূরণের আশ্বাস দেবে। তাহলে তার জ্বীন ছেড়ে যাবে। পরে তার দাবিটি যৌক্তিক হলে পূরণ করা হবে আর অযৌক্তিক হলে পূরণ করা হবে না। এরপর যদি সে আবার জ্বীনে ধরার অভিনয় করে, তাহলে তকে জ্বীনে ধরা রোগী বলে আর বিশ্বাস করার দরকার নেই। অনেক সময় শারীরিক শাস্তির ভয় দেখালে এ ধরনের বাতিল জ্বীন চলে যায়।

৭. যে সব কারণে জ্বীন চড়াও হয়

কিছু বিষয় রয়েছে যার উপস্থিতির কারণে মানুষকে জ্বীনে আছর করে থাকে।

১. প্রেম। কোন পুরুষ জ্বীন কোন নারীর প্রেমে পড়ে যায়, অথবা কোন নারী জ্বীন যদি কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে তাহলে জ্বীন তার ঐ প্রিয় মানুষটির উপর আছর করে।

২. কোন মানুষ যদি কোন জ্বীনের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে বা কষ্ট দেয় তাহলে জ্বীনটি সেই মানুষের উপর চড়াও হয়। যেমন জ্বীনের গায়ে আঘাত করলে, তার গায়ে গরম পানি নিক্ষেপ করলে, কিংবা তার খাদ্য-খাবার নষ্ট করে দিলে জ্বীন সেই মানুষের উপর চড়াও হয়।

৩. জ্বীন খামোখা জুলুম-অত্যাচার করার জন্য মানুষের উপর চড়াও হয়। তবে এটি পাঁচটি কারণে হতে পারে : ক. অতিরিক্ত রাগ, খ. অতিরিক্ত ভয়, গ. যৌন চাহিদা লোপ পাওয়া, ঘ. মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতাও। ঙ. নোংড়া এবং অপবিত্র থাকা।

কারো মধ্যে এ স্বভাবগুলো থাকলে জ্বীন তাকে আছর করে অত্যাচার করার সুযোগ পেয়ে যায়।

৮. জ্বীনের আছরের প্রকারভেদ

মানুষের উপর জ্বীন চড়াও হওয়ার ধরনটি চার প্রকারের হতে পারে।

১. জ্বীন মানুষের সম্পূর্ণ শরীরে প্রভাব বিস্তার করে কিছু সময়ের জন্য।

২. আংশিকভাবে শরীরের এক বা একাধিক অংশে সে প্রভাব বিস্তার করে কিছু সময়ের জন্য। যেমন হাতে অথবা পায়ে কিংবা মুখে।

৩. স্থায়ীভাবে জ্বীন মানুষের শরীরে চড়াও হতে পারে। এর মেয়াদ হতে পারে অনেক দীর্ঘ।

৪. মানুষের মনের উপর কিছু সময়ের জন্য প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ যখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা শুরু করে তখন চলে যায়।

৯. জ্বীনের আছর থেকে বাঁচতে হলে যা যা করতে হবে

এক. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে ও ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে।

কারণ আল্লাহ্ আয়ালা বলেছেন–

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ -

আর যে পরম করুণাময়ের জিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।

(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৬)

হাদীসে এসেছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَنَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانُهَا : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَاِنْ اِسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ كُلُّهَا، فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا النَّفْسِ، وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلا-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘুমিয়ে যায় শয়তান তখন তার মাথার কাছে বসে তিনটি গিরা লাগায়। প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় একটি কথা বলে : তোমার সামনে আছে দীর্ঘ রাত, তুমি ঘুমাও। যখন সে নিদ্রা থেকে উঠে আল্লাহর জিকির করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যখন সে অজু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। এরপর যখন নামায পড়ে তখন শেষ গিরাটি খুলে যায়। ফলে সে সারাদিন কর্মতৎপর ও সুন্দর মন নিয়ে দিন অতিবাহিত করে। আর যদি এমন না করে, তাহলে সারাদিন তার কাটে খারাপ মন ও অলসভাব নিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো–

১. ঠিকমত অজু করলে, নামায আদায় করলে শয়তানের চড়াও থেকে মুক্ত থাকা যায়।

২. খারাপ মন নিয়ে থাকা ও অলসতা শয়তানের কুমন্ত্রণার ফল।

৩. রীতিমত নামায আদায় করলে শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে। কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অলসতা দূর হয়ে যায়।

৪. ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে অজু গোসল করার আগেই আল্লাহর জিকির করা উচিত। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার নির্দিষ্ট দুআ আছে। এটি পাঠ করা সুন্নাত। এতে শয়তানের কুপ্রভাব দূর হয়ে যায়।

দুই. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুআ পাঠ করা

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ قَالَ اِذَا خَرَجَ مَنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، يُقَالُ لَهٗ : كُفِّيْتَ وَوُقِّيْتَ وَهُدَيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانَ ـ

যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি অলা হাওলা অলা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহি (আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর নির্ভর করে বের হলাম। আর তার সামর্থ ব্যতীত পাপ থেকে বাঁচার উপায় নেই এবং তার শক্তি ব্যতীত ভালো কাজ করা যায় না) তখন তাকে বলা হয়, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট, তোমাকে সুরক্ষা দেয়া হলো এবং তোমাকে পথের দিশা দেয়া হলো। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিন. পেশাব-পায়খানাতে যাওয়ার সময় দুআ পাঠ করা :

হাদীসে এসেছে–

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পেশাব-পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জ্বীন নর ও জ্বীন নারী থেকে আশ্রয় নিচ্ছি।) (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ সকল পেশাব-পায়খানার স্থানে জ্বীন শয়তান থাকে। অতএব তোমাদের কেহ যখন এখানে আসে সে যেন বলে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ। (ইবনে হিব্বান)

চার. প্রতিদিন সকলে ও সন্ধ্যায় এ দুআটি তিনবার পাঠ করা

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

আউজু বিকালি মাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা)

অর্থ : আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ বাক্যাবলির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় নিচ্ছি। (তিরমিযী, আহমদ)

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ. قَالَ اَمَا لَوْقُلْتُ حِيْنَ اَمْسَيْتَ : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ.

এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে বলল, গত রাতে আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যখন সন্ধ্যা হবে তখন তুমি বলবে, আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা। তাহলে তোমাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারত না।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৯)

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছ– একটি জ্বীন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আছর করতে চেয়েছিল। তার সাথে আরেকটি জ্বীন ছিল। জিব্রাঈল এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনি এ বাক্যটি বলুন তাহলে ওরা আপনাকে কিছু করতে পারবে না।

(ইবনে আবি হাতেম)

এমনিভাবে কউ যখন কোন স্থানে যায়, আর এ দুআটি পাঠ করে তাহলে তাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا
خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّه شَىْءٌ، حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِه ذٰلِكَ .

যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করল অতঃপর বলল, আউজু বিকালি মাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা (আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ বাক্যাবলির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় নিচ্ছি) তখন তার কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ সে ওখানে অবস্থান করবে।

(মুসলিম, খাওলা বিনতে হাকীম থেকে)

পাঁচ. প্রতিদিন নিদ্রা গমনকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ بِحَفْظِ زَكَاةِ
رَمَضَانَ، فَاَتَانِىْ اٰتٌ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَاخَذْتُهُ وَقُلْتُ
: وَاللّٰهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ
عِيَالٌ وَلِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ : فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَاَصْبَحْتُ
فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : (يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ) .
قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً، وَعِيَالاً
فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ : (اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ،
وَسَيَعُوْدُ) . فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : (اِنَّهُ
سَيَعُوْدُ) . فَرَصدته، فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ
: لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّٰى ﷺ، قَالَ : دَعْنِىْ فَاِنِّىْ
مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ، لَا اَعُوْذُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ،
فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ ﷺ : (يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ

اَسِيْرُكَ) قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً ـ وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ : (اَمَا اِنَّهُ كَذَبَكَ، وَسَيَعُوْدُ) . فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ، فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَاَرْفَعَنَّكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَهٰذَا اٰخَرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ تَزْعَمُ لاَ تَعُوْدُ، ثُمَّ تَعُوْدُ، قَالَ : دَعْنِىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا ، قُلْتُ مَا هُوَ؟ قَالَ : اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ، فَاَقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىْ : (اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ). حَتّٰى تَخْتِمُ الْاٰيَةَ، فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرِبَنَّكَ شَيْطَانَ حَتّٰى تُصْبَحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : (مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ) . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، زَعِمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِى اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ : (مَا هِىَ). قُلْتُ : قَالَ لِىْ اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىْ مِنْ اَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ : (اَللّٰهُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ) . وَقَالَ لِىْ : لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرِبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تَصْبِحُ- وَكَانُوْا اَحْرَصَ شَىْءٌ عَلَى الْخَيْرُ ـ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ . (اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مِنْ تَخَاطَبَ مُنْذُ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ) قَالَ : لَا، قَالَ : ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যাকাতের সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব দিলেন। দেখলাম, এক আগন্তুক

এসে খাদ্যের মধ্যে হাত দিয়ে কিছু নিতে যাচ্ছে। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহﷺ এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমি খুব দরিদ্র মানুষ। আমার পরিবার আছে। আমার অভাব মারাত্মক। আবু হুরায়রা বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকলে বেলা যখন রাসূলুল্লাহﷺ এর কাছে আসলাম, তখন তিনি বললেন, কী আবু হুরায়রা! গত রাতের আসামীর খবর কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার প্রচণ্ড অভাবের কথা আমার কাছে বলেছে। আমি তার উপর দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহﷺ বললেন, অবশ্য সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে।

আমি এ কথায় বুঝে নিলাম সে আবার আসবেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে আবার আসবে। অমি অপেক্ষায় থাকলাম। সে পরের রাতে আবার এসে খাবারের মধ্যে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহﷺ-এর নিকটে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি খুব অসহায়। আমার পরিবার আছে। আমি আর আসবো না।আমি এবারও তার উপর দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা যখন রাসূলুল্লাহﷺ-এর কাছে আসলাম, তিনি বললেন, কী আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার আসামী কী করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার চরম অভাবের কথা আমার কাছে বলেছে। তার পরিবার আছে। আমি তার উপর দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহﷺ বললেন, অবশ্য সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। দেখ, সে আবার আসবে।

তৃতীয় দিন আমি অপেক্ষায় থাকলাম, সে আবার এসে খাবারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলল্লাহﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। তুমি তিন বারের শেষ বার এসেছ। বলেছ, আসবে না। আবার এসেছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দেবো যা তোমার খুব উপকারে আসবে। আমি বললাম কী সে বাক্যগুলো? সে বলল, যখন তুমি নিদ্রা যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে একজন রক্ষক পাহারা দেবে আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা যখন রাসূলুল্লাহﷺ-এর কাছে আসলাম, তখন তিনি বললেন, কী আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার আসামী কী করেছে? আমি

বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে কিছু উপকারী বাক্য শিক্ষা দিয়েছে, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে সে কী শিক্ষা দিয়েছে? আমি বললাম, সে বলেছে, যখন তুমি নিদ্রা যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে একজন রক্ষক পাহারা দেবে আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।

আর সাহাবায়ে কেরাম এ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে যদিও সে মিথ্যাবাদী। হে আবু হুরায়রা! গত তিন রাত যার সাথে কথা বলেছ তুমি কি জানো সে কে?

আবু হুরায়রা বলল, না, আমি জানি না। রাসূলুল্লাহ বললেন, সে হলো শয়তান। (বুখারী)

এ হাদীস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম তা হলো–

১. জনগণের সম্পদ পাহারা দেয়া ও তা রক্ষা করার জন্য আমানতদার দায়িত্বশীল নিয়োগ দেয়া কর্তব্য। আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত আমানতদার সাহাবী।

২. আবু হুরায়রা (রা) দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিলেন। তিনি রাতেও না ঘুমিয়ে যাকাতের সম্পদ পাহারা দিয়েছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এটি একটি মুজেযা যে, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে বর্ণনা শুনেই বুঝতে পেরেছেন শয়তানের আগমনের বিষয়টি।

৪. দরিদ্র অসহায় পরিবারের বোঝা বাহকদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের দয়া ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দয়াকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন না, তাকে কেন ছেড়ে দিলে? কেন দয়া দেখালে?

৫. সাহাবায়ে কেরামের কাছে ইলম বা বিদ্যার মূল্য কতখানি ছিল যে, অপরাধী শয়তান যখন তাকে কিছু শিখাতে চাইল তখন তা শিখে নিলেন ও তার মূল্যায়নে তাকে ছেড়েও দিলেন।

৬. খারাপ বা অসৎ মানুষ ও জ্বীন শয়তান যদি ভালো কোন কিছু শিক্ষা দেয় তা শিখতে কোন দোষ নেই। তবে কথা হলো তার ষড়যন্ত্র ও অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছেন, তবে সে মিথ্যুক। এ বিষয়টিকে শিক্ষার একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

৭. জ্বীন শয়তান মানুষের খাদ্য-খাবারে হাত দেয়। তা থেকে গ্রহণ করে ও নষ্ট করে।

৮. আয়াতুল কুরসী একটি মস্তবড় সুরক্ষা। যারা আমল করতে পারে তাদের উচিত এ আমলটি ত্যাগ না করা। রাতে নিদ্রার পূর্বে এটি পাঠ করলে পাঠকারী সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকবে ও জ্বীন শয়তান কোন কিছু তার উপর আছর ও চড়াও হতে পারবে না।

৯. আয়াতুল কুরসী হলো সূরা আল বাকারার ২৫৫ নং আয়াত–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে।

আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ব্যতীত। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দুটির সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

ছয়. খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলা ও ঘরে প্রবেশের সময় দুআ পাঠ করা

হাদীসে এসেছে–

اِذَا دَخَلَ الرَّسُلُ بَيْتَهٗ، فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهٖ وَعِنْدَ طَعَامِهٖ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَّلَا عِشَاءَ. وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللّٰهُ عِنْدَ طَعَامِهٖ، قَالَ : اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعِشَاءِ .

যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করার সময় ও খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর জিকির করে তখন শয়তান বলে, তোমাদের সাথে আমার খাবার নেই ও রাত্রি যাপনও নেই। আর যখন ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর জিকির করে না, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার রাত যাপন হবে। আর যখন খাবার সময় আল্লাহর জিকির করে না, তখন শয়তান বলে, তোমাদের সাথে আমার রাত যাপন ও খাবার দুটিরই ব্যবস্থা হলো। (মুসলিম হাদীস নং ২০১৮)

ঘরে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট দুআ আছে সেটি পাঠ করবে। দুআ মুখস্থ না থাকলে কমপক্ষে বিসমিল্লাহ ... বলে ঘরে প্রবেশ করবে। এমনিভাবে খাবার সময় বিসমিল্লাহ ... বলে খাওয়া শুরু করবে।

সাত. হাই তোলার সময় মুখে হাত দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ـ

যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে তখন সে যেন তার মুখে হাত দিয়ে বাধা দেয়। কারণ হাই তোলার সময় শয়তান প্রবেশ করে। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

আট. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা

খারাপ জ্বীন শয়তান অপবিত্র ও নাপাক স্থানে বিচরণ করে থাকে। জিনের আছর থেকে বাঁচতে সর্বদা অপবিত্র ময়লাযুক্ত স্থান থেকে দূরে থাকতে হবে। বাচ্চাদের ময়লা আবর্জনা ও নোংড়া অবস্থা থেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যেমন-

فِىْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ مُحْتَضِرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ সকল প্রস্রাব-পায়খানার নোংড়া স্থানগুলোতে শয়তানরা উপস্থিত থাকে। যখন তোমাদের কেউ এখানে গমন করে তখন যেন সে বলে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জ্বীন নর ও জ্বীন নারী থেকে আশ্রয় নিচ্ছি) (আবু দাউদ)

অতএব আমরা এ হাদীস থেকে বুঝলাম জ্বীন, ভূত, শয়তান নোংরা স্থানে অবস্থান করে। এ সকল নোংরা স্থান থেকে সকলের দূরে থাকা উচিত।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, সাধারণত জিনেরা ময়লা আবর্জনা, মল-মূত্র ত্যাগের স্থান, ডাস্টবিন ও কবর স্থানে অবস্থান করে।

(মজমুআল ফাতাওয়া)

নয়. ঘরে আল কুরআন তেলাওয়াত করা বিশেষ করে সূরা আল বাকারা পাঠ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

তোমরা ঘরকে কবরে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে দূরে থাকে। (মুসলিম, হাদীস নং ৭৮০)

এ হাদীস থেকে আমরা ঘরে আল কুরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ জানলাম। ঘরকে কবরে পরিণত করবে না, এর মানে হল ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করবে। আর সূরা আল বাকারা ঘরে তেলাওয়াত করলে শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায়। আমরা জানি সূরা আল বাকারাতেই রয়েছে আয়াতুল কুরসী।

দশ. কোন গর্তে পেশাব-পায়খানা না করা

হাদীসে এসেছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَالُ فِى الْجَحَرَ . قِيْلَ لِقَادَةَ : مَا يَكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجَحَرِ؟ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : اِنَّمَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো এ নিষেধের কারণ কি? তিনি বললেন, বলা হয়ে থাকে গর্ত হলো জ্বীনদের থাকার জায়গা। (আবু দাউদ)

এগার. ঘরে কোন সাপ দেখলে তা মারতে তাড়াহুড়ো না করা

যদি ঘরে কোন সাপ দেখা যায় তবে সাথে সাথে তাকে না মেরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা। তাকে ঘর ছেড়ে যেতে বলা। তারপর যদি না যায় তাহলে মেরে ফেলা।

হাদীসে এসেছে–

হিশাম ইবনে যাহরার মুক্ত দাস আবু সায়েব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরি (রা)-এর সাথে দেখা করার জন্য গেলাম। তাকে নামায পড়া অবস্থায় পেলাম। আমি তার নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। এমন সময় তার ঘরের খাটের নিচে কিছু একটা নড়াচড়া করার শব্দ পেলাম। চেয়ে দেখি একটি সাপ। আমি সেটাকে মেরে ফেলতে উঠে দাঁড়ালাম। আবু সায়েদ (রা) আমাকে বসতে ইশারা দিলেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন আমাকে বাড়ির একটি ঘরের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি কি এ ঘরটি দেখছ? আমি বললাম হ্যাঁ, দেখছি। তিনি বললেন, এ ঘরে বসবাস করত একজন যুবক। সে নববিবাহিত ছিল।

একদিন সে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যোগ দিল। যেহেতু সে নব বিবাহিত যুবক, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়ে বলল, হে রাসূল! আমি নববিবাহিত। আমাকে আমার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন, আর বললেন, সাথে অস্ত্র নিয়ে যেও। আমি তোমার উপর বনু কুরাইযার হামলার আশঙ্কা করছি। যুবকটি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। ঘরে পৌঁছে দেখল, তার স্ত্রী ঘরের বাহিরে দরজার দু পাটের মাঝে দাঁড়ানো। এ অবস্থা দেখে তার আত্মসম্মান বোধে আঘাত লাগল। সে বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো।

স্ত্রী বলল, তাড়াহুড়ো করো না। আগে ঘরে প্রবেশ করে দেখ তোমার ঘরের মধ্যে কি? সে ঘরে ঢুকে দেখল, তার বিছানায় একটি সাপ গোল হয়ে শুয়ে আছে। যুবকটি বর্শা দিয়ে সাপের গায়ে আঘাত করল। এরপর এটাকে ঘরের বাহিরে নিয়ে আসল। সাপটি বর্শার মাথায় ছটফট করছিল। আর যুবকটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল এবং মারা গেল। কেউ জানে না, কে আগে মরেছে, যুবকটি না সাপটি? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করা হলো। তিনি বললেন, মদীনাতে কিছু জ্বীন আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তোমাদের কেউ তাদের কাউকে দেখে তাহলে তাকে তিন দিনের সময় দেবে। তিন দিনের পরও যদি তাকে দেখা যায় তাহলে তাকে হত্যা করবে। কারণ, সে শয়তান।

(বর্ণনায় : মুসলিম, সাপ হত্যা অধ্যায়)

এ হাদীস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম তা হলো–

১. সাহাবায়ে কেরাম অন্যকে ইসলামী বিধি-বিধান ও নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের প্রতি কত দয়াশীল ছিলেন যে, যুদ্ধকালীন সময়ে কেউ স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তা তিনি সাথে সাথে দিয়ে দিতেন। কখনো দেখা গেছে তিনি তার সাহাবীদের নিজের পক্ষ থেকেই জিজ্ঞেস করতেন, কত দিন হলো তুমি বিবাহ করেছ? তোমার বাড়িতে কে আছে? তোমাকে ছুটি দিলাম তুমি বাড়িতে স্ত্রীর কাছে যাও।

৩. ঘরে কোন সাপ দেখলে সাথে সাথে হত্যা করতে নেই। হতে পারে সে জ্বীন। তবে যদি সাপ দেখে বা এর আচার-আচরণ, আলামত দেখে বুঝে আসে এটা জ্বীন নয়, সাপ। তখন হত্যা করা দোষণীয় নয়। আলোচ্য হাদীসে দেখুন, সাপটি বিছানার উপর শুয়ে ছিল। যদি সে সাপ হয়, তাহলে বিছানার উপর তার কী প্রয়োজন?

সে ইঁদুর বা পোকা-মাকর খুঁজবে।

৪. ঘরে এ রকম সন্দেহজনক সাপ দেখলে তাকে উচ্চৈ:স্বরে ঘর ছেড়ে যেতে বলবে। এভাবে তিন দিন বলার পরও সে না গেলে তাকে হত্যা করে ফেলবে।

৫. বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, রাস্তায় কোন সাপ দেখলে জ্বীন মনে করার কোন কারণ নেই। তাকে মেরে ফেলতে হবে। শুধু ঘরের সাপকে জ্বীন বলে সন্দেহ করা যায়। একটি সহীহ হাদীসে এটি স্পষ্ট বলা আছে।

৬. সাপটি জ্বীন ছিল বিধায় সে নিজেকে হত্যা করার অপরাধে হত্যাকারীকে আঘাত করে হত্যা করেছে। কিন্তু সাপটি কিভাবে যুবকটিকে আঘাত করল তা কেউ দেখেনি।

৭. সাপটি মুসলিম জ্বীন ছিল বলে রাসূল ﷺ-এর কথায় ইশারা পাওয়া যায়। সে শুরুতেই তাকে আঘাত করেনি। বা তার স্ত্রীর কোন ক্ষতি করেনি।

৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন রহমাতুললিল আলামীন বা সৃষ্টিকুলের জন্য করুণা। তাই তিনি জ্বীনের প্রতিও করুণা-রহমত দেখিয়েছেন। এ হাদীসটি ছাড়াও অন্যান্য অনেক হাদীস রয়েছে এ বিষয়ে।

৯. 'কারণ সে শয়তান' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার অর্থ হলো, সে জ্বীন নয়, সে প্রাণীদের মধ্যে দুষ্ট ও ক্ষতিকর। তাকে হত্যা করো।

১০. জ্বীনকে অযথা হত্যা করা অন্যায়।

বার. স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় দুআ পাঠ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَاِنَّهُ اِنْ يَقْدِرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَاِنَّهُ اِنْ يَقْدِرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

তোমাদের কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছে করে তখন যদি বলে, বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতান, অজান্নিবিশ শাইতান মা রাযাকতানা (আল্লাহর নামে আমরা মিলিত হচ্ছি, হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন আর আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখুন) তাহলে এ মিলনে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

তের. সন্ধ্যার সময় বাচ্চাদেরকে বাহিরে বের হতে না দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اِذَا كَانَ جَنَحَ اللَّيْلُ، اَوْ اَمْسَيْتُمْ، فَكَفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَاِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةُ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ، وَاَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغَلَّقًا.

যখন রাত্রি ডানা মেলে অথবা তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখবে। বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখবে। কারণ, তখন শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর দরজা বন্ধ করে দেবে। আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। জেনে রাখ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। (বুখারী)

এ হাদীস থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জানতে পারলাম–

১. সন্ধ্যার সময় বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার নির্দেশ।

২. সন্ধ্যার আগে বাচ্চাদের ঘরে আসার জন্য বলতে হবে। তখন তাদের ঘর থেকে বের হতে বারণ করবে।

৩. সন্ধ্যার কিছু পরে এ আশঙ্কা থাকে না। তখন বাচ্চাদের বের হতে বারণ নেই।

৪. সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ।

৫. আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, জ্বীন বা শয়তান ঘরের বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।

৬. দরজা খোলা ও বন্ধের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চৌদ্দ. জ্বীনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া বা তাদের সাহায্য না নেয়া

মানুষ যদি জ্বীনদের কাছে কোন কিছু চায় বা তাদের সাহায্য গ্রহণ করে তাহলে তাদের ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তারা মানুষের উপর চড়াও হতে উৎসাহ পায়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ـ

আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল। (সূরা আল জ্বীন : আয়াত-৬)

অনেক ওঝা-ফকীরকে দেখা যায় তারা তাবীজ-তদবীরের ক্ষেত্রে জ্বীনের সাহায্য নেয়। এটা অন্যায়।

১০. জ্বীনের আছরের চিকিৎসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জ্বীনের আছর করা রোগীর চিকিৎসা করেছেন। হাদীসে এসেছে–

عَنْ يَعْلَى ابْنِ مَرَّةَ قَالَ : رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَجَبًا مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَتَتْهُ اِمْرَأَةُ بِصَبِّي لَهَا بِهِ لَمَمٌ، فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُخْرُجْ عَدُوَّ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَ : فَبَرَ فَلَمَّا رَجَعْنَا جَاءَتْ اُمُّ الْغُلَامِ بِكَبْشَيْنِ وَشَيْءٍ مِنْ اَقَطٍ وَسَمَنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ا: يَا يَعْلٰى خُذْ اَحَدَ الْكَبْشَيْنِ، وَرَدَّ عَلَيْهَا الْاٰخَرَ، وَخُذِ السَّمَنَ وَالْاَقَطَ، قَالَ : فَفَعَلْتُ.

ইয়ালা ইবনে মুররা বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে গেলাম তখন আমরা এক স্থানে অবস্থান করলাম তখন একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখলাম। এক মহিলা নিজের একটি বাচ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। বাচ্চাটি অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর দুশমন বের হয়ে যা! আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, এ কথা বলার পর বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে গেল। যখন আমরা সে স্থান থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন বাচ্চাটির মা দুটি ভেড়া, কিছু ঘি ও ছানা নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইয়ালা! ভেড়া দুটি মধ্যে একটি রেখে দাও। অন্যটি মহিলাটিকে ফেরত দাও। আর ঘি ও ছানা রেখে দাও। ইয়ালা বলেন, আমি তাই করলাম। (বুখারী, দালায়েলুন নবুওয়াহ)

হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারলাম :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বাচ্চাটিকে জ্বীন মুক্ত করেছেন।

২. বাচ্চাটির মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া দিলেন। কেউ উপকার করলে তাকে হাদিয়া দেয়া যায়। এমনিভাবে জ্বীন মুক্ত করার তদবীর করলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া যায়।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়ার কিছু অংশ ফেরত দিলেন। হতে পারে মহিলাটি নিজ সামর্থের চেয়ে বেশি দিয়েছে। হয়ত এ কারণে তাদের কষ্ট হবে, এ জন্য রাহমাতুললিল আলামীন হাদিয়ার কিছু অংশ ফেরত দিলেন।

জ্বীনের রোগীর কাছে কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত তেলাওয়াত করা

সম্পূর্ণ আল কুরআনই শিফা বা আরোগ্য লাভের মাধ্যম। আল কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনকে শিফা বলেছেন। আল কুরআন শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা নয়, বরং আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা– এ ধরনের খণ্ডিত ব্যাখ্যা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল-কুরআনকে আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে শিফা বলেছেন। তিনি বা তাঁর রাসূল কখনো বলেননি যে, শিফা বা

আরোগ্য বলতে আধ্যাত্মিক রোগের শিফা বুঝানো হয়েছে। তাই যারা বলবেন, আল কুরআনকে শারীরিক ব্যাধির জন্য শিফা বলা যাবে না, তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। যাই হোক জ্বীনে ধরা রোগীর কাছে আল কুরআনের বিশেষ বিশেষ কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা হলে জ্বীন ছেড়ে যায় আর রোগী ভালো হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন (রহ) কর্তৃক আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে তেত্রিশটি আয়াতের কথা বর্ণিত আছে। যদিও হাদীসের সনদটি সহীহ নয় কিন্তু আল কুরআনের আয়াতের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি নিজেও একাধিকবার দেখেছি সুন্নাতের পাবন্দ একজন আলেমের কাছে জ্বীনে ধরা রোগী নিয়ে আসা হলো। তিনি তেত্রিশটি আয়াত পাঠ করে তাকে শুনালে জ্বীন চলে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এ রকম দৃশ্য বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। কুরআনের বরকত ও প্রভাব কত যে ব্যাপক ও সুদূর প্রসার তা কি আমরা সকলে অনুধাবন করতে পারি?

আর সে তেত্রিশটি আয়াত হলো : সূরা ফাতেহা পর সূরা আল বাকারার ১ থেকে ৪ আয়াত, সূরা আল বাকারার ২৫৫ থেকে ২৫৭ আয়াত, যার মধ্যে আয়াতুল কুরসী রয়েছে। সূরা আল বাকারার ২৮৪ থেকে ২৮৬ আয়াত। সূরা আল আরাফের ৫৪ থেকে ৫৬ আয়াত, সূরা আল ইসরার (বনী ইসরাইল) ১১০ থেকে ১১১ আয়াত। সূরা আস সাফফাতের ১ আয়াত থেকে ১১ নং আয়াত। সূরা আর রাহমানের ৩৩ আয়াত থেকে ৩৫ নং আয়াত। সূরা জ্বীন এর ১ নং আয়াত থেকে ৪ নং আয়াত। এভাবে তেত্রিশটি আয়াত হয়।

কোন কোন বর্ণনায় এর সাথে সূরা হাশরের ২১ নং আয়াত থেকে ২৪ নং আয়াত পাঠ করার কথা এসেছে। আবার সূরা ইখলাস, সূরা কাফেরূন, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাছ পাঠ করার কথাও এসেছে।

তবে মূল কথা হলো তেত্রিশ আয়াত পাঠ করতে হবে এমন কোন বিধান নেই। আগেই বলেছি এ সংক্রান্ত হাদীসটির সনদ সহীহ বলে প্রমাণিত নয়। বরং এ আয়াতগুলো ও এর সাথে অন্যান্য যে সকল আয়াতের কথা আলোচনা হয়েছে এগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে খুবই অর্থবহ, তৎপর্যপূর্ণ, বরকতময়। আর অভিজ্ঞতায় এর কার্যকারিতা প্রমাণিত।

যেমন সূরা ফাতেহার কথা সকলের কাছে সুবিদিত যে, তার এক নাম হলো সূরা শিফা। আয়াতুল কুরসীর ফযিলত সম্পর্কে সকলের জানা। সূরা বাকারার শেষ

আয়াতসমূহের ফযিলত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস রয়েছে। সূরা সাফফাত পাঠে জ্বীন শয়তান ভয় পেয়ে যায় বলে হাদীসে এসেছে। সূরা ফালাক ও সূরা নাস সকল প্রকার যাদু টোনা ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ইত্যাদি।

তাই জ্বীন ধরা রোগীর কাছে এ সকল আয়াত তেলাওয়াত করা হলে জ্বীন ছেড়ে যায় ও রোগী সুস্থ হয় বলে অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। এবং এটি মহান আল্লাহর কালামের একটি বরকত ও শিফা।

জ্বীনে ধরা রোগীর চিকিৎসার জন্য তাবীজ-কবচ ব্যবহার, লোহা পড়া, ঘর বন্ধক দেয়া ইত্যাদি তদবীর করা ঠিক নয়। তবে কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত দুআ-জিকির দিয়ে ঝাড়-ফুঁক, তেল পড়া, পানি পড়া ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি আছে।

১১. জ্বীনের অধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বীনদের ব্যাপারে তোমাদের ভাই শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মুসলিম জিনেরা হলো আমাদের ভাই। তাদের অধিকার রক্ষায় যত্নবান হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে–

আলকামা বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বীনের রাতে আপনাদের মধ্যে কি কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন? তিনি বললেন, না। কিন্তু ঘটনা হলো, আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তাঁকে আমরা পেলাম না। আমরা তাকে বিভিন্ন ঘাঁটি ও পাহাড়ে খোঁজ করতে থাকলাম। আমরা বলতে লাগলাম তিনি উধাও হয়ে গেছেন অথবা কেউ তাকে অপহরণ করেছে। আসলে সে রাতটি আমরা অত্যন্ত খারাপভাবে কাটিয়েছি। যখন সকাল হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের দিক দিয়ে আমাদের কাছে হাজির হলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে হারিয়েছিলাম। অনেক খোঁজা-খোঁজি করেছি।

আপনাকে না পেয়ে আমরা খুব দুঃচিন্তায় রাত কাটিয়েছি। তিনি বললেন জ্বীনদের মধ্য থেকে একজন আহ্বানকারী এসেছিল আমার কাছে। আমি তার সাথে গেলাম। আমি তাদের কুরআন পাঠ করে শুনালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সে স্থানের দিকে চললেন। তিনি আমাদের তাদের পদচিহ্নগুলো দেখালেন। তাদের আগুনের আলামতগুলোও দেখালেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের খাদ্য-খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের খাবার হলো সে সকল জন্তু জানোয়ারে হাড্ডি যা আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়েছে। এর মধ্যে যা তোমাদের নাগালে আসে তা তোমরা খাবে। এটা

তোমাদের জন্য গোশত বলে গণ্য হবে। আর তোমাদের পালিত জানোয়ারের গোবরও তোমাদের খাদ্য।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা এগুলো দিয়ে কখনো ইসতেনজা (শৌচ কর্মে ব্যবহার) করবে না। কেননা এটা তোমাদের ভাইদের (জ্বীনদের) খাদ্য।

হাদীস থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম

১. জ্বীনদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত ঘটনার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করতে পারি।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ج فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْآ اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ـ

আর যখন আমি জ্বীনদের একটি দলকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হলো, তখন তারা বলল, চুপ করে শোন। তারপর যখন পাঠ শেষ হলো, তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল।

(সূরা আল আহকাফ : আয়াত-২৯)

২. সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কত ভালোবাসতেন। তাদের মন্তব্য দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাকে না পেয়ে সে দিন তারা জীবনের সবচেয়ে খারাপ রাত অতিবাহিত করেছে।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে শিক্ষা দিতে বা তথ্য জানাতে কোন ধরনের কার্পণ্য বা শিথিলতা করেননি। তাঁর বক্তব্যই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গেছেন। তাদের আলামতগুলো দেখিয়েছেন।

৪. এ হাদীস থেকে জ্বীনদের দুটি খাদ্যের বিষয় জানতে পারলাম। একটি হলো হাড্ডি অন্যটি হলো গোবর।

৫. তাদের খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুটি বস্তুকে শৌচকর্মে ব্যবহার করতে নিষিদ্ধ করেছেন। এটা জ্বীনদের অধিকার রক্ষার একটি বিষয় হিসেবে গণ্য হলো।

৬. জ্বীনদেরকে আমাদের ভাই বলে তাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই জ্বীন মানেই আমাদের শত্রু নয়। তাদের মধ্যে যারা মানুষকে কষ্ট দেয় বা বিভ্রান্ত করে তারাই মানুষের শত্রু।

কয়লা কি জ্বীনদের খাদ্য?

অনেক ফিকাহের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়লা দিয়ে ইসন্তেজা (শৌচ কর্ম) করা যাবে না। কারণ কয়লা হলো জ্বীনদের খাদ্য।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য একটি হাদীস এসেছে। হাদীসটি হলো—

قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ انْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا قَالَ : فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ ـ

জ্বীনদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মত হাড্ডি, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইসতেনজা করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা এগুলোকে আমাদের জন্য খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ সকল বস্তু দিয়ে ইসতেনজা করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

সনদ সূত্রের দিক দিয়ে হাদীসের মান হলো :

ইমাম নববী (রহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব গ্রন্থে লিখেন, এ হাদীসটি আবু দাউদ, দারে কুতনী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ হাদীসটিকে যয়ীফ (দুর্বল সূত্র) বলেননি। কিন্তু দারে কুতনী ও বায়হাকী হাদীসটি দুর্বল সূত্রের বলে অভিমত দিয়েছেন।

হাদীসে বর্ণিত হামামা শব্দের অর্থ হলো কয়লা। আমাদের সাথীরা ফিকাহ শাস্ত্রে এ রকম লিখেছেন। আর অভিধানবিদরাও এ অর্থ করেছেন।

ইমাম আল খাত্তাবী (রহ) বলেন, আল হামাম শব্দের অর্থ আল ফাহাম বা কয়লা। যা সৃষ্টি হয় কাঠ, হাড্ডি ইত্যাদি পোড়ালে। এ দিয়ে ইস্তেনজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটাকে জ্বীনদের খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এটা অপবিত্র করা জায়েয নয়।

জ্বীন যেমন মুসলমান আছে তেমনি আছে কাফের। এ ব্যাপারে জ্বীনদের বক্তব্য আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এভাবে—

وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ـ

আর নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম এবং আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সীমালংঘনকারী। কাজেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাই সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। (সূরা আল জ্বীন : আয়াত-১৪)

কাজেই মুসলিম জ্বীনেরা সে সকল অধিকার পাবে যা একজন মুসলিম মানুষ ইসলামের কারণে পেয়ে থাকে।

জ্বীনদের কুরআন তেলাওয়াত শোনা ও তার উত্তর প্রদান

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لَقَدْ قَرَأْتُهَا، سُوْرَةَ (الرَّحْمٰنِ) عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوْا أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ (فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، قَالُوْا : لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ.

আমি জ্বীনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে তাদের সূরা আর রাহমান পাঠ করে, শোনালাম। তারা তেলাওয়াত শুনে তোমাদের চেয়ে উত্তম জওয়াব দিত। যখন এ আয়াত পাঠ করতাম সুতরাং তোমাদের রবের কোন নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তখন তারা এর উত্তরে বলত, হে আমাদের রব! আমরা আপনার কোন নিআমতকে অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তো আপনারই।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আলবানী (রহ) এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আস সিলসিলাতুস সহীহা-১৮৩/৫)

এ হাদীস থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম

১. জ্বীনদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করেছেন তার মধ্যে সূরা আর রাহমানও ছিল।

২. এ জ্বীন সাহাবীরা সূরা আর রাহমান শুনে আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছে তা মানুষ সাহাবীদের চেয়ে সুন্দর উত্তর ছিল বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন।

৩. কোন কোন ক্ষেত্রে জিনেরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও তারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলে সর্বক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়াটা জরুরি নয়।

৪. আল কুরআন পাঠ করে বা তার পাঠ শুনে সে মোতাবেক উত্তর দেয়া সুন্নাত। যেমন আলোচ্য হাদীসে দেখা গেল। আল্লাহ তাআলার কোন প্রশ্ন আসলে তার উত্তর সাথে সাথে প্রদান করা, এমনিভাবে যখন জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের কথা আসে তখন তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আর যখন জান্নাত ও জান্নাতীদের কথা আসে তখন জান্নাত কামনা করা ইত্যাদি হলো আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ-এর আদর্শ ও আল কুরআন তেলাওয়াতের আদব।

(২)

ইসলামের দৃষ্টিতে তাবীজ কবচ

মূল

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনায়

চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

২. ইসলামের দৃষ্টিতে তাবীজ কবচ

১. তাবীজের সংজ্ঞা

লেসান নামক অভিধানে বলা হয়েছে– তামীম অর্থ হচ্ছে তাবীজ (রক্ষা কবজ) শব্দটির একবচন তামীমা। আবু মনসুর বলেছেন, তামীম দ্বারা তাবীজ বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে বলা যায় যে, বিষধর সাপ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য যে পুতি জাতীয় তাবীজ সূতায় গেঁথে গলায় বেঁধে দেয়া হয়, তাকেই তামায়েম কিংবা তামীমা অর্থাৎ তাবীজ বলা হয়।

ইবনে জোনাই (রহ.) থেকে বর্ণিত। অনেকের মতে তাবীজ হচ্ছে ঐ জিনিস, যা তাগায় বেঁধে লটকানো হয়। সা'আলব (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে- আরবরা বলে تَمَّمْتُ الْمَوْلُوْدَ এর অর্থ হলো- আমি শিশুর গলায় তাবীজ ঝুলিয়ে দিয়েছি।

এক কথায় বলা যায় যে, মানুষের গলায় বা অন্যান্য অঙ্গে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যেসব তাবীজ ধারণ করা হয়, সেগুলোকেই তামীমা বলা হয়।

ইবনে বরী বলেন- কবি সালমা বিন খরশবের নিম্ন বর্ণিত কবিতায় 'তামীমা' এর অর্থই গৃহীত হয়েছে। কবি বলেন :

تَعُوْذُ بِالرُّقِيِّ مِنْ غَيْرِ خَبْلٍ وَتَعَقُّدِ فِيْ قِلاَئِدِهَا التَّمِيْمِ

অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক এবং তাবীজ তুমারের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে বিপদ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর তার গলায় তাবীজ বেঁধে দেবে। আবু মনসুর বলেছেন, اَلتَّمَائِمُ একবচন হচ্ছে تَمِيْمٌ আর তমীমা হলো, দানা জাতীয় তাবীজ। বেদুঈনরা বদ নজর থেকে হিফাজতে থাকার জন্য এ ধরনের তাবীজ তাদের শিশুদের এবং তাদের সন্তানদের গলায় লটকিয়ে দিত। ইসলাম তাদের এরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বাতিল করে দেয়।

হাজলী তার নিম্ন-বর্ণিত কবিতা থেকে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন : অর্থাৎ, সে মৃত্যুবরণ করলে, মৃত্যুর পর মুজায়্যেনা (একটি গোত্রের নাম) তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে সফল হবে না। সুতরাং, হে মুজায়্যেন! তার উপর তাবীজ ঝুলিয়ে দাও। আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, اَلتَّمَائِمُ হলো تَمِيْمَةٌ-এর বহুবচন। আর তা হচ্ছে তাবীজ বা হাড় যা মাথায় লটকানো হয়।

জাহেলী যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, তাবীজ দ্বারা বিপদ আপদ দূর হয়ে যায়।

ইবনূল আছীর (র) বলেছেন اَلتَّمَائِمُ শব্দটি বহুবচন, এর এক বচন হলো تَمِيْمَةٌ অর্থ- তাবীজ। আরবরা শিশুদের গলায় তাবীজ লটকাত, যাতে বদ নজর না লাগে। ওটাই তাদের আকীদাহ্। অতঃপর ইসলাম তাদের এই আকীদাকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। ইবনে উমর (রহ.) হাদীসে এসেছে- তুমি যে 'আমল করেছ, আমি তার কোন পরোয়াই করি না (অর্থাৎ তার কোন মূল্যই নেই) যদি তুমি তাবীজ লটকাও। অন্য এক হাদীসে এসেছে, যে তাবীজ ব্যবহার করে, আল্লাহ তার কোন কিছুই পূর্ণ করবেন না। (কারণ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবীজের উপর ভরসা করেছে) বস্তুতঃ আইয়ামে জাহেলিয়া তথা জাহেলী যুগে মানুষের ধারণা ছিল, তাবীজ হচ্ছে রোগমুক্তি ও চিকিৎসার পরিপূর্ণতা।

তাবীজ ব্যবহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এতে লিখিত তাকদীরকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাকদীরের নিয়ন্ত্রণকারী, অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের মাধ্যমে ক্ষতি ও দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা হয়। এর উপরোল্লিখিত আভিধানিক সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তাবীজ দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

প্রথমত: ঐ সমস্ত রোগ-ব্যাধি এবং বদ নজর থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে, যা এখনও সংঘটিত হয়নি। শিশুর গলায়, ঘোড়ার ঘাড়ে এবং ঘর-বাড়িতে যে সকল তাবীজ ঝোলানো হয়, সেগুলোতে উক্ত উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত: যে বিপদ এসে গেছে, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যে তাবীজ ব্যবহার করে, তার উদ্দেশেও স্পষ্ট। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

উল্লেখ্য যে, "বিষধর সাপ থেকে বাঁচার জন্য যে তাবীজ নেয়া হয়, তাকে তামীমা বলে।" এ ধরনের সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ বুঝা গেলেও মূলতঃ তামিমা শুধু ওতেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, আরবরা خَرَزٌ (দানা জাতীয় তাবীজ) ব্যতীত অন্যান্য তাবীজও ব্যবহার করত। যেমন, তারা খরগোশের হাড় তাবীজ হিসেবে ব্যবহার করত, আর এর দ্বারা তারা মনে করত, বদ নজর ও যাদু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং, তাদেরকে এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন হাদীসে এসেছে- ঘোড়ার ঘাড়ে লটকানো ধনুকের ছিলাসমূহ ছিঁড়ে ফেলার জন্য রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন। মোদ্দা কথা, উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য দ্বয়ের

জন্য যা কিছুই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেটাই হচ্ছে তামিমা তথা তাবীজ। সেটা خَرَزٌ হোক বা কাঠ জাতীয় বস্তু হোক। সেটা ঘাস বা পাতা হোক, অথবা খনিজ জাতীয় পদার্থ হোক, অর্থাৎ তাবীজ বস্তুটি যাই হোক না কেন, তা মন্দ থেকে হিফাযতে থাকার জন্য অথবা মন্দকে দূর করার জন্য ব্যবহার করা হলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ সেটা শিরক হবে। কারণ, বস্তুর স্বত্তা এবং تَمِيْمَةٌ উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য হয়, তার নাম যাই দেয়া হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মদের মূল কাজ হচ্ছে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করা। অতএব, যে সকল বস্তু পান বা ভক্ষণ করলে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেগুলোই মদ। মদ হবার জন্য আঙ্গুর থেকে তৈরি হতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই। আর তাবীযের ব্যাপারটিও তাই। এখানে কোন নির্দিষ্টতা নেই।

২. তাবীজ হারাম হওয়ার দলীলসমূহ

প্রথমত: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন :

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই, পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা আন'আম : আয়াত-১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থাৎ এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে, তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তার অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইউনূস : আয়াত-১০৭)

অন্যত্র আল্লাহ্ বারী তাআলা বলেন–

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ج ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ -

অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর, তা তো আল্লাহ্‌রই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুল ভাবে আহ্বান কর। আর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করে।

(সূরা নাহ্‌ল : আয়াত-৫৩ ও ৫৪)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দুঃখ-কষ্ট দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আর বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই ভালো-মন্দের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনিই একমাত্র শক্তিধর, যিনি কোন মাধ্যমে বা বিনা মাধ্যমে মঙ্গল, অমঙ্গল সাধনে সক্ষম।

মাধ্যম আবার দুই প্রকার। শরীয়তী মাধ্যম ও প্রকৃতিগত মাধ্যম।

শরীয়তী মাধ্যম

শরীয়তী মাধ্যম হলো, যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সরাসরি কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস শরীফে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন : দুআ এবং শরীয়তসম্মত ঝাড়-ফুঁক। শরীয়তী মাধ্যমসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এবং তার ইচ্ছায় বান্দার মঙ্গল সাধন করে বা অমঙ্গল দূরীভূত করে।

সুতরাং, এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহারকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই এগুলো ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, এগুলোই হচ্ছে মাধ্যম। তাই ভরসা রাখতে হবে শুধু আল্লাহ্‌র উপর, মাধ্যমের উপর নয়। কেননা, তিনিই এ সমস্ত মাধ্যমসমূহ তৈরি করেছেন। এগুলো দ্বারা মঙ্গল-অমঙ্গল দান করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। অতএব, শুরু, শেষ তথা সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল থাকতে হবে তাঁরই উপর।

আর প্রাকৃতিক মাধ্যম হচ্ছে বস্তু এবং তার প্রভাবের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, যা খুবই স্পষ্ট, এমনকি মানুষ সেটা বাস্তবে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন : পানির পিপাসা দূর করার মাধ্যম। শীতবস্ত্র শীত নিবারণের মাধ্যম। তদ্রূপ

বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা ঔষধ রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়। এ সবই হচ্ছে প্রাকৃতিক মাধ্যম। ইসলামী শরীয়ত এগুলো ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। কারণ, এগুলো ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, যিনি এ সমস্ত জিনিসে নির্দিষ্ট গুণাবলি দান করেছেন, এবং তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এসব গুণ বাতিল করে দিতে পারেন, যেমন বাতিল করেছিলেন ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্য প্রজ্বলিত আগুনের দাহন শক্তি।

কিন্তু তাবীজাবলির মধ্যে আদৌ কোন ফলদায়ক প্রভাব নেই এবং তা কোন অমঙ্গল দূর করতে পারে না। এতে জড় বস্তুর কোন প্রভাব নেই। তাছাড়া, মহান আল্লাহ এগুলোকে কোন শরয়ী মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেনি। এবং মানুষ স্বাভাবিকভাবে এগুলোর কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়াও অনুভব করে না, দেখতেও পায় না। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এগুলোর উপর ভরসা করা, মুশরিকদের মৃত ব্যক্তি এবং মূর্তির উপর ভরসা করার সমতুল্য, যারা না শুনে, না দেখে, না পারে কোন উপকার করতে, আর না পারে কোন ক্ষতি সাধন করতে।

কিন্তু তারা মনে করে, এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে তাদের জন্য উপকার বয়ে নিয়ে আসবে, অথবা অমঙ্গল প্রতিহত করবে। তারা আরো ধারণা পোষণ করে যে, এগুলোর মধ্যে নির্ধারিত বরকত রয়েছে, পূজারিদের মধ্যে ঐ বরকত স্থানান্তরিত হয়ে তাদের ধন সম্পদ ও রিয্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলোকে বরকতময় করে তোলে। তাবীজসমূহ হারাম হওয়ার দলীলের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ অন্যতম। আল্লাহ রাব্বুল ইযযত বলেন :

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

(সূরা মায়িদা : আয়াত-২৩)

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন– ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেছেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করাকে ঈমানের শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল না থাকলে ঈমানই থাকবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা (আ) জবানীতে বলেন :

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আত্ম সমর্পণকারী হও, তাহলে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-৮৪)

এখানে বলা হয়েছে, তাওয়াক্কুল হলো ইসলামে শুদ্ধ হওয়ার দলীল কিংবা প্রমাণ। অন্যত্র আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ আর মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপরই নির্ভর করা।

(সূরা ইব্‌রাহীম : আয়াত-১)

এখানে মুমিনদের অন্যান্য গুণবাচক নাম উল্লেখ না করে এজন্যই মুমিন উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের দাবিদার হওয়ার জন্য তাওয়াক্কুল থাকা শর্ত এবং তাওয়াক্কুলের শক্তি ও দুর্বলতা, ঈমানের শক্তি ও দুর্বলতার উপর নির্ভর করে। বান্দার ঈমান যতই মজবুত হবে, তার তাওয়াক্কুলও ততই শক্তিশালী হবে। আর যখন ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে, তাওয়াক্কুলও তখন দুর্বল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর পবিত্র কুর'আনের কোন কোন স্থানে তাওয়াক্কুল ও ইবাদতকে একত্রে উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও তাওয়াক্কুল ও ঈমানকে একত্রে অথবা তাওয়াক্কুল ও তাক্বওয়াকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাওয়াক্কুল ও ইসলাম একই সাথে কিংবা তাওয়াক্কুল ও হেদায়েত একত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান ও ইহ্‌সানের সবস্তরে এবং ইসলামী সকল কার্যাবলির মূল হচ্ছে তাওয়াক্কুল। শরীরের সাথে যেমন মাথার সম্পর্ক, সকল ইবাদতের সাথেও তদ্রূপ তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক। শরীর যেমন মাথা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না, তেমনি ঈমানী কার্যাবলিও তাওয়াক্কুল ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পরে না। শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন- উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ইবাদত এবং ইহা ফরয। এ জন্যই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা শিরক। শাইখুল ইসলাম বলেন, মানুষের উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করা শিরক। আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন :

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ -

অর্থাৎ এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এ দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-৩১)

শায়খ সুলায়মান আরো বলেছেন- গাইরুল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল দুই প্রকার।

১. এমন সব বিষয়ে গাইরুল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা, যা বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সক্ষম নয়। উদাহরণস্বরূপ, ঐ সব লোকদের কথা বলা যেতে পারে, যারা মৃত্যু ব্যক্তি ও শয়তানের (মূর্তি) উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তাদের কাছে হিফাযত, রিয্ক ও শাফায়াতের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। এটা বড় শিরক। কারণ, ঐ সব জিনিসের উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা নেই।

২. স্বভাবগত স্পষ্ট জিনিসের উপর তাওয়াল। যেমন, কেউ রাজা-বাদশাহ্ বা আমীরের উপর এমন বিষয়ে তাওয়াক্কুল করল যা আল্লাহপাক তাদের ক্ষমতার আওতাধীন করে রেখেছেন। যথা: খাদ্য প্রদান বা কারো ক্ষতি থেকে বাঁচানো ইত্যাদি ইহা শিরকে খফী (অপ্রকাশ্য শিরক) বা ছোট শিরক। তবে অন্যের উপর কোন ব্যাপারে নির্ভর করা জায়েয, যদি ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তার উপর তাওয়াক্কুল করা জায়েয হবে না, যদিও তাকে ঐ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বরং তাওয়াক্কুল করবে একমাত্র আল্লাহর উপর, যাতে তিনি কাজটি সহজ করে দেন। শাইখুল ইসলামও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণরূপে তাবীজাবলির উপর ভরসা করা নিঃসন্দেহে প্রথম প্রকারের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, মৃত্যু ব্যক্তি বা মূর্তি ইত্যাদির উপর ভরসা করার মতো, যেগুলোর কোন ক্ষমতা নেই এবং প্রকাশ্য স্বভাবগত কোন মাধ্যমও তাতে নেই। এ বিষয়ে শেষের দিকে আরো স্পষ্ট আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয়ত: হাদীসের আলোকে তাবীজাবলি হারাম হওয়ার স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীস আছে, :

১. হাদীসে আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰىْ رَجُلاً فِىْ يَدِهٖ حِلْقَةٌ مِنْ صَفْرٍ فَقَالَ مَا هٰذِهٖ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَاِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ اِلاَّ وَهْنًا فَاِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِىَ عَلَيْكَ مَا اَفْلَحْتَ اَبَدًا ـ

অর্থাৎ ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির হাতে তামার চুড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? সে বলল : এটা ওয়াহেনার অংশ। তিনি বললেন : এটা খুলে ফেল, কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। যদি এ তাবীজ বাঁধা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে কখনও সফলকাম হতে পারবে না।

(সহীহ্, মুসনাদে আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ্)

২. হাদীসে আছে–

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ اَتَمَّ اللّٰهُ لَهٗ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللّٰهُ لَهٗ .

উকবা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে ﷺ বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না, আর যে কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ্ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।

(আহমদ, হাকেম)

৩. হাদীসে আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ اِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَاَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هٰذَا قَالَ : اِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهٗ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ .

উকবা বিন আমের আল-জোহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্র ﷺ খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর দলটির নয়জনকে বায়াত করালেন এবং একজনকে করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! নয়জনকে বায়াত করালেন, আর একজনকে বাদ রাখলেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার সাথে একটি তাবীজ রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তাকেও বায়াত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করল সে শিরক করল। (সহীহ মুসনাদে আহমদ, হাকেম)

একদা হুজায়ফা (রা) এক রোগীকে দেখতে এসে তার বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, তাদের অনেকেই শিরক করছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ থেকে প্রমাণিত হয়, হুজায়ফার (রা.) মতে তাবীজ ব্যবহার করা শিরক এবং সর্বজনবিদিত এই যে, এটা তাঁর মনগড়া কথা নয় (অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে রাসূলের ﷺ নির্দেশনা পেয়েই তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন)।

'উব্বাদ বিন তামীম (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু বশীর আনছারী (রা.) বলেন যে, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ সঙ্গী ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর বলেন, আমার বিশ্বাস, তিনি (আবু বশীর) বলেছেন যে, মানুষ তাদের বাসস্থানে অবস্থানে করছিল। এমতাবস্থায়, রাসূল ﷺ এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে, একটি উটের গলায়ও ধনুকের ছিলা অথবা (তাবীজ জাতীয়) বেল্ট রাখবে না, সব কেটে ফেলবে।

ইবনে হাজার (র) ইবনে জাওযীর (র) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: ধনুকের ছিলা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনটি রায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল- তাদের ধারণা অনুযায়ী উটের গলায় ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিত, যাতে বদ নজর না লাগে। সুতরাং, উহা কেটে ফেলার উদ্দেশ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, ধনুকের ছিলা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে কিছুই করতে পারে না। আর এটা ইমাম মালেকের (র) বর্ণনা। ইবনে হাজর (রা) বলেন, মোয়াত্তা মালেকের মধ্যে উক্ত হাদীসের বর্ণনার পরেই ইমাম মালেকের (র) কথাটি এসেছে।

মুসলিম (রা) ও আবু দাউদ (র.) ইমাম দ্বয়ের কিতাব সমূহে উক্ত হাদীসের পর উল্লেখ করা হয়েছে: মালেক (র) বলেছেন–

اَرٰى اَنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَجْلِ الْعَيْنِ ۔

অর্থাৎ (আমার মতে, বদ নজর বলতে কোন কিছু নেই বলেই এ আদেশ দেয়া হয়েছে)।

৬. আবু ওয়াহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيْهَا وَاَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْاَوْتَارَ ۔

অর্থাৎ ঘোড়াকে বেঁধে রাখ, তার মাথায় ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দাও এবং লাগাম পরিয়ে দাও। তবে ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিয়ো না। (সুনানে নাসাঈ)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) স্ত্রী জায়নব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ্ বাহির থেকে এসে দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলতেন, যাতে তিনি এসে আমাদেরকে তার অপছন্দ অবস্থায় না দেখেন। তিনি বললেন, একদিন আব্দুল্লাহ আসলেন এবং কাশি দিলেন। তখন আমার কাছে এক বৃদ্ধা ছিল। সে আমাকে চর্ম রোগের জন্য ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে আমি খাটের নিচে লুকিয়ে রাখলাম। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমার গলায় তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন– এই তাগাটা কি? আমি বললাম, এই সুতার মধ্যে আমার জন্য ঝাড়-ফুঁক দেয়া হয়েছে। আমি একথা বলার পর আব্দুল্লাহ তাগাটা কেটে ফেললেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহ্র পরিবারবর্গ শিরক থেকে মুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি :

اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ـ

অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক, তাবীজাবলী এবং ভালোবাসা সৃষ্টির তাবীজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক । (আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

৮. ঈসা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ্ বিন ‘ওকাইম (রা.) অসুস্থ ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁকে বলা হলো, আপনি কোন তাবীজ কবজ নিলেই তো ভালো হতেন। তিনি বললেন : আমি তাবীজ ব্যবহার করব অথচ এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَتَعَلَّقَ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ اِلَيْهِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু রক্ষাকবচ ধারণ করবে, তাকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে। (আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

৯. রোআইফা বিন ছাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

অর্থাৎ হে রোআইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। অতএব, লোকদেরকে এ কথা বলে দেবে যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিল অথবা খেজুরের ডাল লটকালো কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দিয়ে ইস্‌তিঞ্জা করল, তার সাথে মুহাম্মদের ﷺ কোন সম্পর্ক নেই। (আহমদ, নাসায়ী)

এ সমস্ত হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তাবীজ ব্যবহার করা হারাম এবং শিরক। কারণ, রাসূলের ﷺ হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামদের 'আমল দ্বারা তাই সাব্যস্ত হয়। আর তাঁরা রাসূলের ﷺ হেদায়েত, তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়সমূহ এবং যে সমস্ত কাজ তাওহীদকে ক্রটিপূর্ণ করে দেয়, সেগুলো সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেছেন, বালা মুসিবত আসার পূর্বে যা লটকানো হয় তাই তাবীজ। আর বালা-মুছিবতের পরে যা লটকানো হয় তা তাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, এখানে তাবীজ ব্যবহার দ্বারা আয়েশা (রা.) কুরআনের আয়াত থেকে ব্যবহৃত তাবীজ বুঝাতে চেয়েছেন (কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবিজ) কতিপয় ইমাম আল্লাহর কালামের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আয়েশা (রা.) মুসিবত আসার পর কুরআনের আয়াতের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন, কিন্তু মুছিবতের পূর্বেই ইহাও নাজায়েয।

কোন কোন আলেমের মতে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে ঝাড়-ফুঁক এবং লোহার ছেঁকা দেয়ার মত চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এ অর্থে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে, তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা কোন কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না, লোহা পুড়ে ছেক দেয় না, ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে না, বরং তাদের প্রভুর উপরই তাওয়াক্কুল করে। ইবনে হাজার (র.) দাউদী এবং অন্য একটি সম্প্রদায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন : হাদীসের অর্থ এই যে, যারা সুস্থ অবস্থায় রোগ হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও এসব জিনিস পরিহার করে, আর একথা উপস্থাপন করলাম ইবনে কুতায়বার প্রদত্ত বর্ণনা থেকে। ইবনে আব্দুল বারও এ মত পোষণ করেন।

আয়েশা (রা.) التمائم। দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল তাবীজ বুঝাননি (বরং শুধু কুরআনের আয়াতের তাবীজ বুঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য) কারণ, অন্যান্য তাবীজাবলী যে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তা আয়েশার (রা.) কাছে অজানা ছিল না। (ফাতহুল বারী)

৩. তাবীজ ব্যবহার করা কি বড় শিরক, না ছোট শিরক?

তাবীজ ব্যবহার করা কোন ধরনের শিরক, এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তাবীজের হাক্কীকত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করাকে বেশি সংগত মনে করছি।

অতএব, আল্লাহর নিকট তাওফীক চেয়ে বলছি:

আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হলো : বান্দা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তার নিকট প্রার্থনা করা, কোন কিছু আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, কিংবা তার নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না, অথবা তার নিকট মীমাংসা চাওয়া, অথবা আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, অথবা তার কাছ থেকে শরীয়তের বিধান গ্রহণ করা কিংবা তার জন্য (বা তার নামে) যবাই করা, অথবা তার নামে মানত করা, অথবা তাকে এতটুকু ভালোবাসা যতটুকু আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব রূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোর কিংবা কোন একটি গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করাই হলো শিরক এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে কাইয়ূম র. যা বলেছেন, তার সারমর্ম নিম্নরূপ :

আল্লাহপাক তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব জাতি তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারে, তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিতে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিধানই যেন বাস্তবায়িত হয়ে যায়। সকল আনুগত্য তাঁর জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রার্থনা যেন তাঁর উদ্দেশ্যেই হয়।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শিরক দুই প্রকার।

প্রথমত: যা আল্লাহর জাত (সত্তা), নাম ও গুণাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত: যা তাঁর ইবাদত মুয়ামালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যদিও শিরকে লিপ্ত বান্দা মনে মনে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর জাত, গুণাবলি ও কাজে কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

প্রথমোক্ত শিরক আবার দুই প্রকার যেমন :

১. **শির্কুত ত্বাতীল** : এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য শিরক । ফিরআউনের শিরক এই প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত। এটি আবার তিন প্রকার। প্রথমত: সৃষ্টিকে তার স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও কার্যাবলিকে অস্বীকার

করে মহান স্রষ্টাকে তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তৃতীয়ত: আল্লাহর সাথে মুয়ামালাত বা কার্যাবলির মাধ্যমে অস্বীকার করা, যেগুলো আল্লাহর একত্ববাদে বান্দার উপর স্বীকৃতি দেয়া ওয়াজিব।

২. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বা মা'বুদ সাব্যস্ত করা : মূলতঃ শিরক হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টা হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলি দরকার, সেগুলির ক্ষেত্রে কোন লোক সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যপূর্ণ করলে, সে মুশরিক হয়ে যাবে। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধিকারী হওয়া ইলাহীর বৈশিষ্ট্য, তথা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত।

আর এ সব গুণাবলির একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা ভয় করা, কোন কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবলমাত্র তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি এসব গুণকে কোন মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে, তা হলে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক করল। আর দুর্বল, নিঃস্ব কোন কিছুকে ক্ষমতাবান, স্বাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার সাথে তুলনা করা খুবই নিকৃষ্ট মানের তুলনা। যে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যতা অবস্থান করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব জাহির করে এবং তার প্রশংসা করার জন্য, তাকে সম্মান করার জন্য তার কাছে অবনত হওয়া ও আশা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে, তাহলে ঐ ভয় করা, আশা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে নিশ্চয়ই সে আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। শিরক হলো আল্লাহর প্রতি অতি নিকৃষ্ট একটি ধারণা।

সুতরাং, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম দাঁড় করানো, তাঁর প্রভুত্ব, রবুবিয়ত ও একত্ববাদের প্রতি চরম আঘাত এবং তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এরূপ ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। আর স্বাভাবিক জ্ঞান ও নিষ্কলুষ প্রকৃতিও তা পরিত্যাগ করে এবং সুস্থ প্রকৃতি ও উন্নত স্বভাবের নিকট এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

শায়খ মোবারক ইবনে মাইলী বলেছেন- আল্লাহ্ ওয়া জাল্লা জালালুহু সর্বপ্রকার শিরক এক সাথে উল্লেখ করে বলেন–

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ - وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ .

অর্থাৎ বল : তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও মালিক নয় এবং এত দু-ভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা : আয়াত-২২ ও ২৩)

এ থেকে বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতে শিরককে চার ভাগে শ্রেণি বিভাগ করেঃ প্রত্যেক শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আমরা প্রত্যেক প্রকারের জন্য এমন নাম নির্ধারণ করব, যাতে একটি অপরটি হতে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

شِرْكُ الْاِحْتِيَازِ (শিরকুল ইহতিয়াজ) অর্থাৎ মালিকানার শিরক। আসমান ও জমিনের মধ্যে অণুপরিমাণ বস্তুর উপরও অন্য কারো মালিকানাকে আল্লাহ বারী তাআলা অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত: شِرْكُ الشِّيَاعِ (শিরকুশ শি'য়া) অর্থাস্ফদ্ম অংশীদারিত্বের শিরক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় রাজত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অপরের সব ধরনের অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করেছেন।

তৃতীয়ত: شِرْكُ الْاِعَانَا (শিরকুল ইয়ানা) অর্থাৎ সাহায্য সহযোগিতার শিরক। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজে অন্য কারো সাহায্যকারী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি বোঝা উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অন্যকে সাহায্য করে।

চতুর্থত: شِرْكُ الشَّفَاعَةِ (শিরকুশ শাফাআত) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন কারো অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন, যে তার মর্যাদার বলে আল্লাহর সম্মুখে

উপস্থিত হয়ে সুপারিশ করে কাউকে মুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ কোন প্রকার শিরকই পছন্দ করেন না, তা যত দুর্বল ও সূক্ষ্মই হোক না কেন। তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে বিনম্র ভাবে অনুমতি লাভ করে সুপারিশ করলে শিরক হবে না।

উল্লেখিত আয়াতে সব ধরনের শিরকের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, শিরক হবে হয়তো প্রভুত্বের ক্ষেত্রে, নতুবা কার্যকলাপের মাধ্যমে। আবার প্রথম প্রকারের শিরক হয় আল্লাহ্র অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে নিজ অধিকারভুক্ত করে নিবে, অথবা তার অংশ যৌথভাবে বহাল থাকবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় প্রকারের শিরক প্রভুর জন্য সাহায্যকারী হবে, অথবা প্রভুর নিকট অন্য কারো জন্য সাহায্যকারী হবে। এই চার প্রকার শিরকের কথাই উক্ত আয়াতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতের অনুসরণে শিরকের প্রকার সমূহের এরূপ আলোচনা আল্লামা ইবনুল কাইউম (র.) ব্যতীত, আমার জানা মতে অন্য কেই করেননি। ইবনুল কাইউম (রা.) এই চারটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা ঐ সকল মাধ্যমকে, মুশরিকরা যেগুলো অবস্থান করেছিল, সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে দিয়েছেন। বস্তুত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাউকে অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার ঘর বানানোর ন্যায়, আর মাকড়সার ঘর হচ্ছে সব চেয়ে দুর্বল ঘর।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ - وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ -

অর্থাৎ বল : তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা : আয়াত-২২ ও ২৩)

মুশরিকরা যখন কারো নিকট থেকে কোন প্রকার উপকার পাওয়ার আশা করে কেবল তখনই সে তাকে মা'বুদ বা উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নেয়। আর বলা বাহুল্য যে, উপকার একমাত্র তার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, যার মধ্যে এই চারটি গুণের একটি হলেও বিদ্যমান আছে। গুণগুলো হলো–

১. উপাসনাকারী যে জিনিসের আশা করে তার মালিক হওয়া।

২. মালিক না হলে মালিকের অংশীদার হওয়া।

৩. অংশীদারও না হলে, সে জিনিসের ব্যাপারে মালিকের সাহায্যকারী হওয়া।

৪. সাহায্যকারীও না হলে, অন্তত: পক্ষে মালিকের কাছে কারো সম্পর্কে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখা।

সুতরাং, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত আয়াতে শিরকের এই চারটি স্তরকে ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বে অন্য কারো মালিকানা, অংশীদারিত্ব, সাহায্য সহায়তা এবং তাঁর কাছে সুপারিশের ক্ষমতা বিন্দুমাত্রও নেই। তবে, আল্লাহ যে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছেন, সেটা তাঁর অনুমতিক্রমে হয় বলে তাতে মুশরিকদের জন্য কোন অংশ বা সুবিধা নেই।

শায়খ মাইলী (র.) সম্ভবতঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়ূমের (র) এই উক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তদুপরি তার উক্তি উবনুল কাইয়ূমের উক্তির প্রায় কাছাকাছি। এতে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের অভিন্ন মত পাওয়া যায়। আবার আবুল বাকা যুফী (র.) তার কুল্লিয়াত নামক কিতাবে শিরককে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. شِرْكُ الْاِسْتِقْلَالِ (শিরকুল ইসতিকলাল) দুজন ভিন্ন ভিন্ন শরীক সাব্যস্ত করাকে শিরকুল ইসতিকলাল বলা হয়। যেমন, মূর্তিপূজা করে থাকে।

২. شِرْكُ التَّبْعِيْضِ (শিরকুত তাবঈদ) একাধিক মা'বুদের সমন্বয়ে এক মা'বুদ হওয়ার বিশ্বাসকে শিরকুত তাবঈদ বলা হয়। যেমন, নাছারাদের শিরক।

৩. شِرْكُ التَّقْرِيْرِ (শিরকুত তাকরীর) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদের ইবাদত করা যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাকে সহায়তা করে। যেমন, প্রাচীনকালের লোকদের শিরক অর্থাৎ জাহেলী যুগের শিরক।

৪. (শিরকুত তাকলীদ) শِرْكُ التَّقْلِيْدِ অন্যদের অনুসরণ করে গাইরুল্লাহর ইবাদত করাকে শিরকুত তাকলীদ বলা হয়। যেমন, জাহেলী মধ্যযুগের শিরক।

৫. (শিরকুল আসবাব্) شِرْكُ الْاَسْبَابِ ক্রিয়ার প্রভাবকে সাধারণ মাধ্যম সমূহের সাথে সার্বিকভাবে সম্পৃক্ত করাকে শিরকুল আসবাব্ বলা হয়। যেমন, দার্শনিক, জড়বাদী এবং তাদের অনুসারীদের শিরক।

৬. (শিরকুল আগরাদ) شِرْكُ الْاَغْرَاضِ গাইরুল্লাহর জন্য কোন কাজ করাকেই শিরকুল আগরাদ বলা হয়। লেখক বলেন, আমার মতে এখানে অনেক ধরনের শিরক আছে যেগুলো আল্লামা কাফাবী (র.) স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেননি। তবে, সেগুলো তাঁর নির্দেশিত মৌলনীতির আওতায় এসে যায়। যথা : শিরকুত তা'আও অর্থাৎ ইবাদতের শিরক। এটা শিরকের ক্ষেত্রে মৌলনীতি। এই মৌলনীতির আওতায় অনেক প্রকার শিরক এসে যায়। যেমন : ইয়াহুদী এবং নাসারাদের শিরক। তারা আল্লাহর তোয়াক্কা না করে হালাল-হারামের উৎস মনে করে তাদের ধর্ম যাজকদেরকে। এরূপ হারামকে হালাল মনে করার শিরক, আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শিরক, আল্লাহর বিধান অস্বীকার করার শিরক, মুনাফিকীর শিরক এবং গাইরুল্লাহকে ভালোবাসার শিরক। এ সকল শিরক, মনোবৃত্তি, মনোবাসনা, কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের ইবাদত করায় যে শিরক হয়, তার আওতায় এসে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ

অর্থাৎ তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিতে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তবুও কি তোমরা চিন্তা ভাবনা করো না।

(সূরা জাসিয়া : আয়াত-২৩)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ -

অর্থাৎ হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৬০)

শিরক দুই প্রকার। যথা : শিরকে আকবর অর্থাৎ বড় শিরক এবং শিরকে আছগর অর্থাৎ ছোট শিরক। দুনিয়া এবং আখেরাতের দিক দিয়ে এই দুই প্রকার শিরকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- বড় শিরকে যে ব্যক্তি লিপ্ত হবে তাকে দুনিয়াতে ধর্ম বিচ্যুতির দন্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তার যাবতীয় আদান-প্রদান ও লেন-দেনের ব্যাপারে মুরতাদের (ধর্ম বিচ্যুত লোক) বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে। ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا -

অর্থাৎ, আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা রূপ করে দেব। (সূরা ফুরকান : আয়াত-২৩)

আর আখিরাতে তার শাস্তি হচ্ছে, সে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। কারণ, শিরকের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এটি ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা : আয়াত–৪৮)

তবে শিরকে আছগর তথা ছোট শিরক জঘন্য হলেও, তার হুকুম বড় শিরক থেকে ভিন্নতর। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, ছোট শিরক হচ্ছে কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য। তবে হ্যাঁ, এটা জঘন্য হলেও বড় শিরকের সমকক্ষ নয়। তার চেয়ে অনেক নিম্নে। এখন কথা হচ্ছে, আমরা কীভাবে উভয় শিরকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করব এবং সহজেই এই ফয়সালা করতে পারব যে, তাবীজ ব্যবহার কোন ধরনের শিরক?

উল্লেখ্য যে, ছোট শিরক ও বড় শিরকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অনেক নীতিমালা রয়েছে। যেমন :

১. বাক্যের শব্দাবলিতে শিরকী অর্থ বিদ্যমান, কিন্তু উক্তিকারী বাক্য দ্বারা গাইরুল্লাহর জন্য কোন প্রকার ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে করেনি। এমতাবস্থায়, এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ তথা ব্যবহার করা হবে ছোট শিরক। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলকে ﷺ বলেছেন :

لِمَنْ قَالَ لَهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ قَالَ اجْعَلْتَنِى لِلّٰهِ نِدًّابَلْ مَاشَاءُ اللّٰهُ وَحْدَهٗ ـ

অর্থাৎ (আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেছেন) রাসূল ﷺ বলেছেন : তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে ফেললে? এ ভাবে না বলে তোমার উচিত শুধু আল্লাহ যা চেয়েছেন বলা। (আহমদ)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে–

لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ ـ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন : তামরা এ রকম কথা বলো না, আল্লাহ এবং অমুক লোক যা ইচ্ছা করেছেন, বরং বলবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করেছেন'। (মুসনাদে আহমদ)

সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) বলেছেন : শব্দ বা বাক্যের শিরক হচ্ছে অপ্রকাশ্য শিরক এবং ওটা ছোট শিরক।

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।

(সূরা বাকারাহ, : আয়াত-২২)

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : আন্দাদা অর্থ হচ্ছে এমন শিরক, যা রাতের অন্ধকারে মসৃণ কালো পাথরের উপর পিঁপড়ার চলাচলের চেয়েও অধিক গোপন। এই শিরকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন তুমি কাউকে বলে

বসলে যে, হে অমুক! আল্লাহ এবং তোমার জীবনের শপথ, অথবা বলল : এই কুকুর না হলে আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করত, এই হাঁস বাড়িতে না থাকলে ঘরে চোর আসত, কিংবা একজন আর একজনকে বলল, আল্লাহ এবং আপনার ইচ্ছায়'। এভাবে কেউ বলল, আল্লাহ এবং অমুক না হলে সে কিছুই করতে পারত না' এ ধরনের সব কথাই হচ্ছে শিরক। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতের তাফসীরে আকরামা (রা.) বলেছেন, তার উদাহরণ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম নিয়ে শপথ করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ ـ

অর্থাৎ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করল, সে কাফির হয়ে গেল অথবা মুশরিক হয়ে গেল। (আহমদ)

এই হাদীসে শিরক বা কুফর দ্বারা ছোট শিরক বুঝানোই উদ্দেশ্যে, যেমন ইবনে আব্বাসের (রা.) হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যা আগে উল্লেখিত হয়েছে। এভাবে কাউকে গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস বানানো, যথা: আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হোসাইন (হোসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম) ইত্যাদি। এ ধরনের নাম রেখে গাইরুল্লাহর সাথে দাসত্বের সম্পর্ক করাও শিরক।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে শিরক বিদ্যমান থাকা (অর্থাৎ ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে শিরকী ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়া) যেমন, এমন কোন লোক ভালো ও পুণ্য কাজ করল, যার অন্তরে ঈমান নেই অথবা শুধু পার্থিব স্বার্থ এবং ইহকালীন জীবনের লক্ষেই কেউ তার কর্ম তৎপরতা পরিচালিত করে। এরূপ অবস্থায় এটা হবে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহপাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, তাহলে দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের ফল দান করি এবং সেথায় তাদের কম দেয়া হবে না, তাদের জন্য পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে, আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (সূরা হুদ : আয়াত-১৫ ও ১৬)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছোট শিরকও বিদ্যমান থাকতে পারে। যথা : কোন মুসল্লী তার সালাতকে এ জন্যই ঠিক মতো এবং সুন্দর ভাবে আদায় করছে যে, তাকে কোন লোক লক্ষ্য করে দেখছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন : এরূপ করা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে এসেছে : জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসূল ﷺ বের হলেন, অতঃপর বললেন :

أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شِرْكُ السَّرَائِرِ قَالَ يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مَنْ نَظَرَ النَّاسَ إِلَيْهِ فَذَاكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ ـ

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে দূরে থেকো। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! গোপন শিরক কি? তিনি বললেন, কোন লোক সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ায়, আর অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সালাত আদায় করে। কারণ, তার প্রতি মানুষ লক্ষ্য করছে। এটাই হলো গোপন শিরক। (সুনানে বায়হাকী ও ইবনে খুযায়মা)

যায়েদ বিন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) একদিন মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আর মা'আজ বিন জাবালকে (রা.) রাসূলুল্লাহর ﷺ কবরের কাছে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : হে মা'আজ! তোমাকে কোন জিনিস কাঁদাচ্ছে? মা'আজ (রা) বললেন : সে হাদীসটি আমাকে কাঁদাচ্ছে, যেটা রাসূলকে ﷺ আমি বলতে শুনেছি : সামান্যতম রিয়াও (অর্থাৎ লোক দেখানো) শিরক, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতা করে সে যেন আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদেরকে ভালোবাসেন যারা পুণ্যবান, পরহেজগার এবং অপরিচিত, যারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের চিনে না। তাদের অন্তর হেদায়েতের প্রদীপ। তারা বের হয়, এ অন্ধকার ধুলাময় স্থান থেকে।

(হাকেম ও ইবনে মাজাহ)

ইমাম আবুল বাকা কাফাবী বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের ছোট শিরকে লিপ্ত লোককে এমন কাফের বলা যাবে না, যে, ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। শিরকের আর একটি ধরন হলো দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ কিংবা আমল করা, তাহলো দুনিয়া তার একক অথবা একমাত্র উদ্দেশ্যে নয় বরং দুনিয়ার সাথে সাথে সে আখেরাতের প্রতিদানও চায়। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় সুনাম এবং আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার আশায় জিহাদ করেছে অথবা জিহাদে তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে দুনিয়ার সম্পদ ও আখিরাতে প্রতিদান পাওয়া।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَتَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ اِنْ اُعْطِىْ رَضِىَ اِنْ لَمْ يُعْطِ سَخَطَ۔

অর্থাৎ ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হোক ক্ষুধার গোলাম, ধ্বংস হোক পোশাকের গোলাম। যদি দেয়া হয় তো সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেয়া হয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়। (বুখারী কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়-৭০)

আর যদি কোন লোক একবারেই সওয়াবের নিয়ত না করে শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্যেই কোন আমল করে, তাহলে তা হবে বড় শিরক, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র সম্পদ লাভের আশায় সালাত আদায় করে কিংবা কালিমা শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করে।

৩. আসবাব বা মাধ্যম সম্পর্কিত শিরক : যেমন, কোন ব্যক্তি মাধ্যমের উপর ভরসা করে, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে মাধ্যম নয় এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতেও মাধ্যম নয়। এমনি ভাবে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায়ও মাধ্যম নয়। এ ধরনের শিরক একটি শর্ত সাপেক্ষে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শর্ত হলো, মাধ্যমের উপর পরিপূর্ণ ভাবে ভরসা না করা। অর্থাৎ, সে যেন এই ধারণা পোষণ না করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকেই এই মাধ্যম একক ভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী, অথবা যাকে সে মাধ্যম মনে করে, তার উদ্দেশ্যে কিছু ইবাদতও করে। (শর্তে বর্ণিত দুটি অবস্থায় বড় শিরক হবে)। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) নিম্নে বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় :

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةِ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ـ

অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শিরক, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শিরক। আমরা প্রত্যেকেই বিপদগ্রস্ত হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাওয়াক্কুলের কারণে আমাদেরকে বিপদমুক্ত করেন (আহমদ, আবু দাউদ ও হাকেম)

এমনি ভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস থেকেও তা বুঝা যায়। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিয়ারা (পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করণ) যে ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখল সে বস্তুতঃ শিরক করল। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কাফফারা কি? রাসূল ﷺ বললেন : একথা বলা যে, হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কারো কল্যাণ নেই, তোমার তিয়ারা ব্যতীত আর কারো তিয়ারা নেই, এবং তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। (আহমদ)

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী বলেন : যে সকল কথা ও কাজ মানুষকে শিরক পর্যন্ত পৌছায়, তাকে ছোট শিরক বলে। যেমন : কোন মাখলুক বা সৃষ্টির ব্যাপারে এতখানি বাড়াবাড়ি করা যে, তার ইবাদত করা শুরু হয়ে যায়, অথচ সৃষ্টি কখনও ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে না। যথা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা এবং সামান্য রিয়া প্রকাশ করা ইত্যাদি। উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছোট শিরক মূল ঈমানের কোন ক্ষতি সাধন করে না এবং সম্পূর্ণরূপে গাইরুল্লাহর ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় না। একাধিক দলীল দ্বারা ছোট শিরকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রথমত: রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট কাজকে ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করা। যেমন :

রাসূল ﷺ বলেছেন :

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ ـ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক। সাহাবাগণ (রা.) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! ছোট শিরক কি?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল। (আহমদ)

দ্বিতীয়ত: কোন কাজকে শিরক বা কুফর আখ্যায়িত করে শরীয়তে তার জন্য মুরতাদের শাস্তি অপেক্ষা নিম্নতর শাস্তির বিধান করা, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ কাজটি ধর্ম বিচ্যুতির ন্যায় কুফর। বরং তা ছোট শিরক এবং কুফরের মিলিত অপরাধ। যেমন, কোন মুসলিমকে হত্যা করা।

মুসলিম হত্যাকে রাসূল ﷺ কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়তে মুসলিম হত্যাকারীর শাস্তি হলো কিসাস। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে দিয়ত বা রক্তপণও নিতে পারে। পক্ষান্তরে, যে মুরতাদ পুনরায় ইসলামে ফিরে না আসে, তার শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড) কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা যায় না। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী হলেও আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু একজন মুরতাদকে মুসলিমের ঈমানী ভাই বলে আখ্যায়িত করা নাজায়েয।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই। সুতরাং, তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে (সম্পর্ক) সংশোধন করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১০)

তৃতীয়ত: সাহাবী কর্তৃক কোন কাজ শিরক বলে আখ্যায়িত করা অথবা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যে, ঐ কাজটি ছোট শিরক। যেহেতু রাসূল ﷺ সাহাবাদের (রা.) কাছে আকীদাহ্ সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন যে, তাদের নিকট অন্য কিছুর সাথে শিরকের সংমিশ্রণ হতো না। অতএব, এ বিষয়ে যে কোন সাহাবীর (রা.) কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

তাবিজ ব্যবহার করা ছোট শিরক, না বড় শিরক?

তাবীজ ব্যবহার করা শিরকুল আসবাব-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের শিরক শিরককারীর মনের অবস্থা ও তার ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো বড় শিরক, আবার কখনো ছোট শিরক হয়ে যায়। সুতরাং, তাবিজ ব্যবহার করাকে সাধারণভাবে বড় শিরক বা ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং

তাবিজ ও তাবিজ ব্যবহারকারীর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। তাবিজ যদি কোন মূর্তির ছবি হয়, অথবা এমন শিরকী মন্ত্র তা,বিজে লেখা থাকে, যেগুলোর মাধ্যমে গাইরুল্লাহর কাছে শিফার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হলে নিঃসন্দেহে তা বড় শিরক।

এভাবে যদি কেউ কড়ি বা সুতা ইত্যাদি গলায় ধারণ করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, ঐ গুলো বালা-মুসিবত দূর করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তাহলে এটিও বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি এ ধরনের ধ্যান-ধারণা না হয়, তাহলে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে

আমরা এখন এ সম্পর্কে কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কিছু উক্তি বর্ণনা করছি।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রচিত "কিতাবুত তাওহীদ" –এর উদ্ধৃতি দিয়ে লুবাব নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালা-মুসিবত দূর করার জন্য কিংবা বালা-মুসিবত থেকে হিফাযতে থাকার জন্য চুড়ি, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শিরক। এ বিষয়টি পুরাপুরিভাবে বুঝতে হলে আসবাব বা মাধ্যমের হুকুম সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, বান্দার আসবাব বা মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি ধারণা থাকতেই হবে।

১. কোন জিনিসকে সবব বা মাধ্যম মনে না করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে শরয়ী প্রমাণ না পাওয়া যায়।

২. কোন বান্দা মাধ্যমের উপর ভরসা করবে না, বরং যিনি মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপরই ভরসা করবে এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওটা ব্যবহার করবে ও আল্লাহ চাইলে উপকৃত হওয়ার আশা রাখবে।

৩. এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মাধ্যম যত বড় ও শক্তিশালীই হোক না কেন, তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর ফয়সালা ও তাকদীরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখান থেকে বের হওয়ার কোন ক্ষমতাই তার নেই। আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবেই এর মধ্যে তাসাররুফ করেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর হিকমত অনুসারে এর সবব হওয়ার গুণকে বহাল রাখেন, যাতে বান্দা তা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে এবং তাতে নিহিত আল্লাহর হিকমতকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, তিনি মাধ্যমকে এর ক্রিয়া ও প্রভাবের সাথে কি সুন্দরভাবে সম্পৃক্ত করেছেন। আবার তিনি ইচ্ছা করলে

মাধ্যম হওয়ার গুণকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন যাতে বান্দা তার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা না করতে পারে, আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং জানতে পারে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ফয়সালার মালিক একমাত্র আল্লাহই। সব ধরনের আসবাব তথা মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তা ও ব্যবহারে বান্দার উপরোক্ত ধারণা থাকা আবশ্যক তথা ফরয। একথা জানার পর এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি কেউ মুসীবত আসার পরে তা দূর করার জন্য অথবা মুসিবত আসার পূর্বে তা প্রতিহত করার জন্য ত'বিজাবলী বা সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে তা শিরক হবে। কেননা, সে যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, এটিই মুসিবত দূর করে বা প্রতিহত করে, তাহলে তা হবে বড় শিরক।

যেহেতু, সে সৃষ্টি এবং পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে, তাই এটা হবে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে শরীক করা। আর, যেহেতু সে একে উপকারের মালিক মনে করে তার কাছে আশ্রয় চেয়েছে এবং এ আশায় অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, তখন এটি হবে ইবাদতের মাধ্যমে শরীক করা। অন্যদিকে, যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, মুসিবত দূর করার ও প্রতিহত করার মালিক একমাত্র আল্লাহই কিন্তু তাবীজাবলী বা সুতা ইত্যাদিকে সে এমন সবব মনে করে, যার দ্বারা মুসিবত দূর করা যায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে এমন বস্তুকে সবব ধারণা করল যা শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং প্রাকৃতিকভাবে সবব নয়। তাই এটা শরীয়ত ও প্রকৃতির উপর একটি মিথ্যা অপবাদ। কেননা, শরীয়ত এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, আর যে বিষয়ে নিষেধ আছে সেটা কোন উপকারী সবব বা মাধ্যম হতে পারে না এবং প্রাকৃতিকভাবে এটা এমন কোন নিশ্চিত বা অনিশ্চিত মাধ্যম নয় যার দ্বারা উদ্দেশ্যে সাধন করা যায়। অনুরূপভাবে এটা কোন বধ উপকারী ঔষধও নয়। অধিকন্তু তা শিরকের মাধ্যম সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ব্যবহারকারী অবশ্যই তার অন্তরকে এর সাথে সম্পৃক্ত করে। আর এটি এক ধরনের শিরক বা শিরকের মাধ্যম।

তাবীজ ঐ সমস্ত জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর সাথে ব্যবহারকারীদের অন্তর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাই ঐ নিয়তে কোন কিছু গলায় ঝোলানো তাবীযেরও একই হুকুম। এভাবে এর কোনটি বড় শিরক আবার কোনটি ছোট শিরক। বড় শিরক যেমন: ঐ সমস্ত তাবীজ, যার মধ্যে শয়তান অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর যে সকল বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না, সেগুলোর ব্যাপারে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য

প্রার্থনা করা শিরক। ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে একটু পরেই আলোচনা আসছে। আর ছোট শিরক ও হারাম হওয়ার দৃষ্টান্ত হল ঐ সকল তাবীজ, যেগুলোতে এমন সব নাম থাকে, যেগুলোর অর্থ বুঝা যায় না এবং যেগুলো শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

শায়খ সুলায়মান ইবনে আব্দুল্লাহ্ বিন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (র.) এরূপই বলেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্যে হলো মুসিবত দূর করা বা প্রতিহত করার জন্য তামা, লোহা বা অনুরূপ কোন ধাতব বস্তু ব্যবহার করা। এর হুকুমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা শিরকে তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত। মহান ও পবিত্র আল্লাহর একমাত্র ইলাহ্ বলতে ঐ সত্তাকে বুঝায়, যার প্রতি হৃদয় আসক্ত হয় এবং যার নিকট এমন বিষয়ের আশা রাখে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে যা শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত এবং সকল আনুগত্য, সকল ইবাদত আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে– আল্লাহর কাছে দু'আ করা, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, ভালো-মন্দ একমাত্র তাঁরই হাতে। শুধু তিনিই ভালো-মন্দ আনয়নকারী ও প্রতিহতকারী।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ নেই তা খণ্ডানোর মত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তাহলে তার মেহেরবা ণীকে রহিত করার মতোও কেউ নেই।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-১০৭)

সুতরাং, যদি কেউ বিশ্বাস রাখে যে, গিড়া, তাগা পরিধান করলে এবং হাঁড় ও তাবীজ ধারণ করলে বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়, তবে সে এ ধরনের বিশ্বাসের কারণে শিরক করল এবং আল্লাহর কাজকে বাতিল করে দিল, যেটা নির্দিষ্ট রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র স্রষ্টার জন্য। এভাবে সে ঐ কাজকে تَمِيْمَةٌ-এর জন্য সাব্যস্ত করে, যেটাকে যথাস্থানে মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে অন্যকে মর্যাদা দিল। এজন্যই নবী করীম ﷺ বাহুতে তামার চুড়ি ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে বলেছেন তা খুলে ফেলতে। কারণ, তা কেবল দুর্বলতাই বাড়িয়ে দেবে। এবং সাথে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কখনও সফল হতে পারবে না। ইমাম

আহমদ (র.) ইমরান বিন হোসাইনের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের এই অংশ مَا اَفْلَحتَ اَبَدًا "তুমি কখনও সফল হতে পারবে না।" দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এটি বড় শিরক, যা ক্ষমার অযোগ্য, এমনকি এর কারণে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْد এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ تَيْسِيْرُ الْعَزِيْزِ الْحُمَيْد নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালা-মুসিবত দূর করার উদ্দেশ্যে গিড়া, তাগা পরিধান করা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার যে, উক্ত কথা দ্বারা শায়খের উদ্দেশ্যে হলো এই যে, ঐ সমস্ত তাবীজকে শুধু মাধ্যম মনে করে ব্যবহার করলে তা ছোট শিরক হবে।

আর যদি ওগুলোর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে, সেগুলোর নিকট থেকে উপকারের আশা করে এবং সেগুলোর সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমন ব্যবহার আল্লাহর সাথে করা উচিত, অথবা তাবীজ যদি শিরকী হয়, যেমন তাতে সৃষ্টির কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, যে সাহায্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না, তা হলে ওটা নিঃসন্দেহে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। تَيْسِيْرُ الْعَزِيْزِ الْحُمَيْد এবং اَلتَّوْضِيْحُ عَنْ تَوْحِيْدِ الْخَلَائِق দ্বয়ে শায়খের আলোচনার সমষ্টি থেকে স্পষ্টভাবে উক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অনুরূপ কথা শায়খ আব্দুল আযীয বিন বাজও বলেছেন।

তিনি বলেছেন- শয়তানের নাম, হাড়, পূতি, পেরেক অথবা তিলিস্মা (অর্থাৎ অর্থবিহীন বিদঘুটে শব্দ বা অক্ষর) প্রভৃতি বস্তু দিয়ে তাবীজ বানানো হলে সেটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনেক সময় উল্লেখিত বস্তুসমূহের তাবীজ ব্যবহারকারী বিশ্বাস করল যে, এই তাবীজ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই তাকে হিফাযত করবে বা তার রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবে অথবা তার দুঃখ-কষ্ট অপসারিত করবে। فَتْحُ الْمَجِيْدُ গ্রন্থের উপর خَامِدِ الْفِقْى কর্তৃক লিখিত হাশিয়া-এর টীকা লিখতে গিয়ে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায বলেছেন :

তাবীজ ব্যবহার করায় দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করা হয় না, বরঞ্চ সেটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং জাহেলিয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অনেক সময় তাবীজ ব্যবহারকারীর ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্তও হয়ে

যায়। যথা : এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই তা উপকার ও ক্ষতি করে। কিন্তু যদি এরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, এটি বদ নজর অথবা জিন ইত্যাদি থেকে হিফাযতে থাকার একটি মাধ্যম, তবে এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ তাবীজকে মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বরঞ্চ তা থেকে নিষেধ করেছেন, এটির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং সেটাকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষায় শিরক বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, ব্যবহারকারীর অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে তাবীজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এভাবে শিরকের দরজা খুলে যায়।

শায়খ হাফেজ হাকামী বলেন :

وَإِنْ تَكُنْ مِمَّا سِوَى الْوَحْيَيْنِ * فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَيْرِ رَمِيْنُ بَلْ
إِنَّهَا قِسِيْمَةُ الْأَزْلَامِ * فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيْمَا أُوْلِي الْإِسْلَامِ -

অর্থাৎ দুই ওহী তথা আল কুরআন ও আল হাদীস ব্যতীত, ইয়াহুদীদের তিলিসমাতি, মূর্তি পূজারি, নক্ষত্র পূজারি, মালাইকা পূজারি এবং জিনের খিদমত গ্রহণকারী ইত্যাদি বাতিল পন্থীদের তাবীজ ব্যবহার; অনুরূপভাবে পুঁতি, ধনুকের ছিলা, তাগা এবং লোহার ধাতব চুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক। কারণ, এগুলো সমস্যা সমাধানের জন্য বধ মাধ্যম কিংবা শরীয়তসম্মত ঔষধ নয়। বরং তাবীজভক্তরা এসব জিনিসে নিজেদের খেয়াল খুশিতে একথা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, ওগুলো অমুক অমুক রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। মূর্তি পূজারিরা যেমন তাদের বানানো মূর্তি সম্পর্কে কতকগুলো মূর্তির হাতে কল্যাণের এবং আর কতকের হাতে অকল্যাণের ক্ষমতা রয়েছে ইত্যাদি।

তাবীজ সম্পর্কে তাবীজ ভক্তদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। মূলতঃ সে তাবীজ জাহেলী যুগের أَزْلَامٌ 'আযলাম' এর সাদৃশ্যপূর্ণ। 'আযলাম' অর্থ হচ্ছে কাঠের অংশ বা টুকরা। জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের সাথে তিনটি কাঠ রাখত। কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে ঐ কাঠগুলো দ্বারা তারা লটারি করত। এগুলোর একটাতে লেখা ছিল اِفْعَلْ অর্থ 'কর' দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল لَا تَفْعَلْ অর্থ 'করো না' এবং তৃতীয়টিতে লেখা ছিল غَفَلْ অর্থ 'অজ্ঞাত'। লটারিতে 'কর' লিখিত কাঠ আসলে কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। 'করো না' লিখিত কাঠ আসলে, যাত্রা স্থগিত রাখত এবং 'অজ্ঞাত' লিখিত কাঠ আসলে পুনরায় লটারি দেয়া হতো।

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে এই ভ্রষ্টতার পরিবর্তে একটি উত্তম পদ্ধতি দান করেছেন। আর সেটা হচ্ছে ইস্তেখারার সালাত ও দু'আ। পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসের বাহিরের তা বিজসমূহ ভ্রান্ত এবং শরীয়ত বিরোধী, আযলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং মুসলিমদের আমল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রকৃত তাওহীদবাদীরা এ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তাদের অন্তরে আছে প্রবল ঈমানী শক্তি। তাঁরা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে। এ জন্যই তাদের তাওয়াক্কুল শুধু আল্লাহর উপর। অন্য কিছুর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা থেকে তারা অনেক দূরে থাকে।

পূর্বে উল্লেখিত দলিলসমূহ এবং শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তাবীজ ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা, তাবীজের স্বরূপ এবং তার মধ্যে লিখিত জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তাবীজকে শুধুমাত্র একটি হুকুমে আবদ্ধ করা সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে, এটাও লক্ষণীয় যে, ছোট শিরক সাধারণ ব্যাপার নয়। তাকে ছোট বলার অর্থ হলো- যে বড় শিরকের কারণে অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে, তার তুলনায় ছোট। অন্যথায় ছোট শিরক কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য। তার দলীল ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত উক্তি।

তিনি বলেছেন :

قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) لِاَنْ اَحْلَفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا اَحَبَّ اِلٰى مَنْ اَنْ اَحْلَفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অনেক উত্তম, গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তু) নামে সত্য শপথ করার চেয়ে। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক) শায়খ সোলায়মান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনে মাসউদের (রা.) এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নামে শপথ করাকে গাইরুল্লাহর নামের শপথে জড়িত আছে সত্যবাদিতা এবং শিরক। আর আল্লাহর নামের শপথে যদিও মিথ্যাবাদিতা বিদ্যমান, তবুও তাতে আছে তাওহীদ। তাই ইবনে মাসউদের (রা.) উল্লেখিত উক্তির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ছোট শিরক অন্যান্য কবিরা গুনাহের তুলনায় সর্বাধিক গুরুতর। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব উল্লেখ করেছেন- বালা-মুসিবত দূর করার জন্য অথবা বিপদ

আপদ থেকে হিফাযতে থাকার জন্য গিড়া এবং তাগা ইত্যাদি ব্যবহার করা ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরামের কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ছোট শিরক কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য। কুরআন ও হাদীসে যে সকল দলীলে ছোট শিরকের প্রসঙ্গ এসেছে, সেগুলোতে ছোট বড় শিরকই শামিল। এ জন্যই ছালফে ছালেহীন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেঈ তাবেয়ীন) ছোট শিরকের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত দলীল পেশ করেছেন যেগুলো মূলতঃ বড় শিরক প্রসঙ্গে এসেছে। ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হুযায়ফা (রা.) থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِافْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করল। (সূরা নিসা : ৪৮ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন:

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (সূরা লুকমান : ১৩ আয়াত।)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে يُشْرِكُ এবং اَلشِّرْكُ দ্বারা ছোট বড় সকল শিরকই বুঝানো হয়েছে। রাসূলের ﷺ কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেছেন : যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়ে সূরা বাকারার এই আয়াত :

فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-এর তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন আন্দাদ্ অর্থ হচ্ছে ছোট শিরক। কিয়ামত দিবসে ছোট শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্য সর্বপ্রথম সম্পন্ন করা হবে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ছোট শিরক কত ভয়াবহ।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি :

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে। তাদের একজন হচ্ছে শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে আসা হবে এবং তার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতসমূহ পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে এবং সে সেগুলো চিনবে (স্বীকার করে নিবে)। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন- তুমি এই নি'আমতগুলোর বিনিময়ে কি আমল করেছ? সে বলবে : আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ যুদ্ধ করেছি। তখন তাকে বলা হবে : তুমি মিথ্যা বলেছে। তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছ যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। তখন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তাদের আর একজন হচ্ছে আলেম, যে নিজে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছে, অন্যকেও তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে প্রদত্ত নি'আমতসমূহের পরিচয় করিয়ে দেবেন। সে ঐ নি'আমতগুলো চিনতে পারবে। প্রশ্ন করা হবে ঐ সমস্ত নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে : আমি নিজে জ্ঞান শিখেছি এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন পাঠ করেছি।

আল্লাহ্ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমিতো এজন্যই ইলম শিখেছিলে যে, তামাকে আলেম বলা হবে এবং এ উদ্দেশ্যেই কুরআন পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে কারী বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন। সে অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের অপরজন হচ্ছে বিত্তশালী, যাকে আল্লাহ্ অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তাঁর দরবারে হাযির করা হবে। এবং তাকে প্রদত্ত নি'আমতসমূহ আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেবেন, আর সেগুলো সে চিনবে (অর্থাৎ স্বীকার করে নিবে)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন- এই নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে দান করা পছন্দ করেন, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি, কোন খাতই আমার দান থেকে বাদ পড়েনি। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি মিথ্যা কথা বললে। তুমিতো সেটা করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে দানশীল বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি আদেশ দেবেন, তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম ইমাম নবীর ব্যাখ্যা সহকারে) যে ভালো কাজে ছোট শিরক মিশ্রিত থাকবে সে আমল বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্যই নেই।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন :

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيْ فِيْهِ غَيْرِيْ تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ.

অর্থাৎ আমি শরীকের শিরক থেকে অনেক পবিত্র। যে ব্যক্তি কোন কাজ করবে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শিরক সহকারে পরিত্যাগ করব। (সহীহ মুসলিম, নবীর (র.) ব্যাখ্যা সহকারে)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক লোক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে (জিহাদের মাধ্যমে) দুনিয়ার সম্পদ (গণিমতের মাল) পেতে চায়। তখন রাসূল ﷺ বললেন :

অর্থাৎ সে কোন সওয়াবই পাবে না। ঐ লোক রাসূলের ﷺ কাছে কথাটি তিনবার পুনারাবৃত্তি করল, কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূল ﷺ বললেন : (সে কোন সওয়াব পাবে না) (হাকেম ও মুসনাদে আহমদ)

আবু উমামা আল বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলের ﷺ নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এক লোক আল্লাহর কাছে সাওয়াব এবং মানুষের কাছে সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছে। তার কি প্রাপ্য? রাসূল ﷺ বললেন : সে কিছুই পাবে না। ঐ ব্যক্তি রাসূলের কাছে প্রশ্নটির একাধারে তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, আর রাসূলে কারীম ﷺ বলে গেলেন : "সে কিছুই পাবে না"। অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহ গাফুরুর রাহীম কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করা হয় এবং এর মাধ্যমে শুধু তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে। (নাসাঈ)

৪. কুরআন ও হাদীসের তাবীজ দুআ হিসেবে ব্যবহার করার হুকুম

কুরআন, হাদীস ও সাহাবাদের মতামতের দলীলের আলোকে ত'বিজ ব্যবহারের হুকুম আমরা আলোচনা করছি। এতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যবহারকারীর অবস্থা ও তাবীযের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কারণে ওটা হয়তো বা শিরকে আকবারে (বড় শিরক) নতুবা শিরকে আছগার (ছোট শিরক) বলে গণ্য হবে। এ হুকুমের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য নেই। তবে কুরআন ও হাদীসের তাবীজ ব্যবহার করার মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

এক শ্রেণির আলেমের মতে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয। আর এই শ্রেণির তাবীজ উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা এই মত পোষণ করেন, তারা হলেন : সাঈদ বিন মুসাইয়িব, আতা আবু জাফর আল-বাকের, ইমাম মালেক। এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ, ইবনে আব্দুল বার, বাইহাকী, কুরতুবী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম এবং ইবনে হাজার।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাহাবা (রা.) এবং তাঁদের পরে যারা এসেছেন, তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয নেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ইবনে আব্বাস, হুযাইফা, উকবা বিন আমের, ইবনে ওকাইম, ইব্রাহীম নাখয়ী, একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ, ইবনুল আরাবী, শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলুশ শায়খ, শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'আদী, হাফেজ আল হাকামী এবং মুহাম্মদ হামিদ আলফাকী। আর সম সাময়িক মনীষীদের মধ্যে আছেন- শায়খ আলবাণী ও শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায প্রমুখ।

প্রথম মত পোষণকারীদের দলীলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ -

অর্থাৎ আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। (সূরা ইসরা : আয়াত-৮২)

২. আয়েশা (রা.) বলেন : নিশ্চয়ই তাবীজ ঐ জিনিস যা বালা-মুসিবতে পতিত হওয়ার পূর্বে শরীরে যা ধারণ করা হয়। পরে যা ব্যবহার করা হয় তা নয়।

(বায়হাকী)

৩. আব্দুল্লাহ বিন আমরের (রা.) ব্যক্তিগত আমলে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রা.) তাঁর ঐ সমস্ত সন্তানদের সাথে তাবীজ ঝুলিয়ে দিতেন, যারা ভয়ের দুআ মুখস্থ করার বয়স পর্যন্ত পৌছে।

দুআটি নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

অর্থাৎ আল্লাহর নামে তাঁর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর গজব ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে) (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, হাসান)

দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ, যারা কুরআন ও হাদীসের তাবীজ ধারণ করা নিষিদ্ধ বলেছেন, তারা প্রথম মতপোষণকারীদের দলীলসমূহকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

কুরআনুল কারীম থেকে তাঁদের পেশকৃত আয়াতটি 'মুজমালা' বা সংক্ষিপ্ত। উপরন্তু রাসূল ﷺ কুরআনে পাক দ্বারা চিকিৎসা করার স্বরূপ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হলো কুরআন তিলাওয়াত এবং সে অনুযায়ী আমল করা। এ ছাড়া কোন কিছু তাবীজ আকারে ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে কোন বর্ণনা নেই। এমনকি এ ব্যাপারে সাহাবাদের থেকেও কোন বর্ণনা নেই। তবে আয়েশার (রা.) উক্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যেহেতু কুরআন থেকে লটকানোর কোন বর্ণনা তাঁর ঐ হাদীসে নেই, বরং শুধুমাত্র বলা হয়েছে- 'তাবীজ' ঐ জিনিস, যা বালা মুসিবতে পতিত হওয়ার পূর্বে (শরীরে) ধারণ করা হয়, পরে নয়। যেহেতু তাঁর এই কথা নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝাচ্ছে না, তাই শুধু এই উক্তির ভিত্তিতেই এটা বলা যাবে না যে, আয়েশার (রা.) মতে কুরআনের তাবীজ ধারণ করা জায়েয।

তা ছাড়া আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, ঐ হাদীসে মুহাম্মদ ইসহাক বর্ণনায় আন্ আনাহ্ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অথচ তিনি মোহাদ্দিসগণের নিকট একজন মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত। (আবু দাউদ)

শায়খ মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকি (র.) ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে যে বর্ণনা এসেছে তা দুর্বল এবং এ ব্যাপারে সেটা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে আমর

(রা.) তাঁর বয়স্ক সন্তাদেরকে ভয়ের দুআ মুখস্থ করাতেন এবং ছোট ছোট সন্তানদের জন্য লোহার পাতে লিখে গলায় লটকিয়ে দিতেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ছোটদের মুখস্থ না থাকার কারণেই তিনি ওটা লটকাতেন, তাবীজ হিসাবে নয়। যেহেতু তাবীজ লেখা হয় কাগজে, পাতে নয়।

ব্যাপারটা যখন এমন, তখন এটা পরিষ্কার যে, কুরআন ও হাদীসের তাবীজ সমর্থনকারীদের পক্ষে শক্তিশালী কোন দলীলই নেই।

নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহের মাধ্যমে নিষিদ্ধকারীদের মতামতের অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়–

১. এই আলোচনায় তাবীজসমূহ হারাম হওয়ার যে সমস্ত দলীল পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোতে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপকতা বিদ্যমান এবং এর বিপরীতে কোন দলীল আসেনি। অতএব, দলীলগুলো ব্যাপকতার ওপর বহাল থাকবে।

২. যদি তাবীজ ব্যবহার বধ হত তাহলে রাসূল (সা) অবশ্যই স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। যেমনি ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং তার মধ্যে যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার অনুমতি দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন :

قَالَ اِعْرَضُوْا عَلٰى رِقَاكُمْ لَا بَاْسَ بِالرُّقِيِّ مَالَمْ يَكُنْ فِيْهَا شِرْكٌ

অর্থাৎ তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার কাছে পেশ কর, ওটা শিরকের আওতাধীন না হলে তাতে কোন প্রকার বাধা নেই। (মুসলিম)

অথচ, তিনি তাবীজ সম্পর্কে এরূপ কিছু বলেননি।

৩. এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার উপর সাহাবাদের (রা.) যথেষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আর যারা তার বিরোধিতা করেছেন, তাদের বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ, সাহাবাগণ এবং অধিকাংশ তাবেয়ী রাসূলের ﷺ হেদায়েত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। বিশেষ করে ইব্রাহীম নখয়ী ব্যাপক অর্থে বলেছেন যে, তারা কুরআন ও কুরআনের বাইরে যাবতীয় তাবীজ খারাপ মনে করতেন।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেন : এ কথা দ্বারা ইব্রাহীম নখয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) সাথী-সঙ্গীদেরকে বুঝিয়েছেন। যেমন আলকমা, আসওয়াদ, আবু ওয়ায়েল, হারেছ বিন সোয়ায়েদ, ওবায়দা সঅলমানী, মাসরুক, রাবী বিন খায়সাম এবং সোয়ায়েদ বিন গাফলাহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ তাবেয়ীগণ। উক্ত উদ্ধৃতিটি ইব্রাহীম নখয়ী (র.) তাবেয়ীনদের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। হাফেজ ইরাকী এবং অন্যান্যদের বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। (ফতহুল মজীদ)

৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ কাজসমূহের পথ বন্ধ করে দোয়া ওয়াজিব, যাতে কুরআনী তাবীযের সাথে শিরকী তাবীজ মিলে না যায়। এ রকম ঘটলে শিরকী তাবীজ নিষিদ্ধ করার সুযোগও থাকবে না।

শায়খ হাফেয হাকামী বললেন নিঃসন্দেহে এ নিষেধাজ্ঞা বাতিল 'আকীদাহ রুদ্ধ করার উত্তম পথ, বিশেষ করে আমাদের এ যুগে। সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ ঈমান বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের সে যুগ অনেক অনেক পবিত্র ছিল। তা সত্ত্বেও, তাঁদের অধিকাংশই তাবীজকে খারাপ মনে করেছেন।

সুতরাং, আমাদের এ ফিতনার যুগে তাবীজ পরিহার করা অধিক উত্তম। আর কেনইবা পরিহার করা উত্তম হবে না, অথচ তাবীজ পন্থীরা এ সুযোগ হারাম ও অত্যাচারের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি তাদের অনেকেই তা'বিজে কুরআনের আয়াত, সূরা, বিসমিল্লাহ্ অথবা এ জাতীয় পবিত্র জিনিস লিপিবদ্ধ করে।

অতঃপর সেগুলোর নিচে শয়তানের তেলেসমাতী লিখে থাকে, যেগুলোর অর্থ ঐ সমস্ত শয়তানী কিতাব যারা পাঠ করেছে, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝে না।

অন্যদিকে তারা সাধারণ মানুষের মন আল্লাহর উপর ভরসা করা থেকে বিমুখ করে, তাদের লিখিত তাবীজের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত শয়তানদের প্ররোচনার কারণে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ তাদের কোন কিছুই হয়নি। অত:পর তাদের প্রতি আসক্তির সুযোগে তাদের সহায়-সম্পদ লুটে নেয়ার ফন্দি আঁটে এবং তাদেরকে বলে, তোমাদের পরিবারে বা ধন-সম্পত্তিতে অথবা এর উপর এরূপ এরূপ বিপদ আসবে, অথবা বলে- তোমার পিছনে জিন লেগেছে ইত্যাদি। এভাবে এমন কতকগুলো শয়তানী কথা-বার্তা তুলে ধরে যেগুলো শুনে সে মনে করে যে, এ লোক ঠিকই বলেছে এবং তার প্রতি সে যথেষ্ট দয়াবান বলেই তার উপকার করতে চায়। ফলে সরলমনা মূর্খ লোকের অন্তর তার কথা শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে এই দাজ্জালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপর ভরসা করতে থাকে।

অবশেষে, তাকে জিজ্ঞেস করে যে, এ বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? তার প্রশ্ন শুনে মনে হয়- যেন ঐ লোকের হাতেই ভালো-মন্দের চাবিকাঠি। এভাবে ঐ প্রতারক স্বীয় উদ্দেশ্যে হাছিল করে নেয়। এবং তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার

জন্য বলে, যদি তুমি আমাকে এত এত পরিমাণ টাকা দাও বা অমুক জিনিস দাও, তাহলে তোমার এতখানি দৈর্ঘ্য-প্রস্তের প্রতিরোধক তাবীজ লিখে দেব এবং আরো সাজিয়ে-গুছিয়ে বলে যে, এই প্রতিরোধক তাবীজ অমুক অমুক বস্তু দিয়ে গলায় ধারণ করবে এবং তাবিজটা এই এই রোগের জন্য ব্যবহার করবে।

শায়খ হাফেজ আল হাকামী বলেন : এই বিশ্বাস বা আকীদাহর সাথে আপনি কি মনে করেন যে, এ কাজটি শিরকে আছগর? না, আদৌ তা নয়। বরং সে তাবীজের মাধ্যমে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হলো, অন্যের উপর ভরসা করল, অন্যের কাছে আশ্রয় চাইল এবং সৃষ্টির কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। আর এভাবে তাবীজকারী তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিল। শয়তান কি কখনো তার ভাই, মানব শয়তানের মাধ্যম ছাড়া এরূপ করার ক্ষমতা রাখে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ

অর্থাৎ বলুন : রহমান থেকে কে তোমাদেরকে হিফাযত করবে রাতে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালন কর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

(সূরা আম্বিয়া আয়াত-৪২)

অতঃপর সে (মানুষরূপী শয়তান) তাবীযের মধ্যে শয়তানের তেলেসমাতির সাথে কিছু কুরআনের আয়াত লিখে দেয় এবং অপবিত্র অবস্থায় তাবীজটি লটকিয়ে দেয়। আর এ অবস্থায় সে পেশাব-পায়খানা করে, কামনা-বাসনা করে। এক কথায়, সর্বাবস্থায় তার সাথে এ তাবীজ ঝোলানো থাকে। যত অপবিত্র অবস্থায়ই হোক না কেন, সে তার বিন্দুমাত্র পরওয়া কিংবা সম্মানও করে না। আল্লাহর শপথ! কুরআনের চরম শত্রুরাও তার এত অমর্যাদা ও বেইজ্জতি করেনি, যা এই মুসলিম দাবিদার শয়তানরা করেছে এবং করছে।

আল্লাহর শপথ! কুরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে একমাত্র এই লক্ষে যে, মানুষ তা তিলাওয়াত করবে, তার মর্ম অনুযায়ী আমল করবে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তার বাণী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে অটুট থাকবে, তার ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এই বিশ্বাস করবে যে, কুরআনের সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। অথচ ওরা

(তাবীজপন্থিরা) এসব লক্ষ্য ত্যাগ করেছে এবং এগুলোকে তারা পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, একমাত্র তা কাগজে লেখা ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখেনি। এভাবে তারা কুরআনকে তারা রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে, আর এ পন্থায় আয়ের যত হারাম ব্যবস্থা আছে তার সব টুকুই গ্রহণ করে নিয়েছে।

যদি কোন শাসক তার অধীনস্থ কাউকে এ বলে চিঠি পাঠায় যে, এটা কর- ওটা ছেড়ে দাও, তোমার পক্ষ থেকে এভাবে নির্দেশ দাও, আর এভাবে নিষেধ কর ইত্যাদি। আর ঐ ব্যক্তি উক্ত চিঠিটা না পড়ে, তার আদেশ নিষেধ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করে, যাদের কাছে শাসক তা প্রচার করতে বলেছে, তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে, তাকে তাবীজ বানিয়ে হাতে ও গলায় ব্যবহার করে এবং তাত যা লেখা আছে তার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত না করে, তবে তাকে নিশ্চয়ই উক্ত শাসক কঠিন শাস্তি দেবেন।

অতএব, দুনিয়ার শাসকের নির্দেশ অমান্য করলে যদি এ পরিণতি হয়, তা হলে নভঃমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সর্বশক্তিমান অধিপতি, রাজাধিরাজ আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের নির্দেশ অমান্য করলে কি ভয়াবহ পরিণতি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

কারণ, তিনি এমন এক সত্তা যাঁর জন্যই সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা এবং যার নিকট সকল কিছুই প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। তিনিই সবার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। আর তিনিই আরশে আযীমের অধিপতি।

(মা 'রেফুল কুরআন ১/৩৮২)

৫. অনেক সময় কুরআনের তাবীজ ধারণ করায় তার অবমাননা করা হয়। যেমন, তাবীজসহ পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি।

৬. যারা কুরআনের অর্থ বুঝে না, অথবা তার সম্মান করতে জানে না, তারা যদি কুরআনের তাবীজ সাথে ধারণ করে, তবে তাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হয়:

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ـ

অর্থাৎ তারা যেন পুস্তক বহনকারী গর্দভ। (সূরা জুমুআ' : আয়াত-৫)

কারণ, তারা তার মর্ম বুঝে না, তার সম্মান সম্পর্কে অজ্ঞ, এমনকি অনেক সময় তার উপর নাপাক লাগিয়ে দেয় যখন সে পাগল বা ভালো মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে না।

৭. কুরআনের তাবীজ ধারণ করলে সাধারণতঃ মোআওয়াজাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ার সুন্নাত প্রথা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কারণ, যারা সম্পূর্ণ কুরআন গলায় ঝুলায় তারা মনে করে- সূরা ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, পূর্ণ কুরআনই তো তারা ধারণ করে আছে।

৮. কুরআনের তাবীজ ঝোলানোর ব্যাপারটা, দলীলের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকার কারণে জায়েয কি হারাম সেটা বলা দুষ্কর। আর যে মাসালার অবস্থা এরূপ হয়, ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য সেসব কার্য পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

৫. তাবীজ ব্যবহার : অতীত ও বর্তমান

তাবীজ ব্যবহার জাহেলী যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সে যুগে মানুষের উপর চেপে বসেছিল অজ্ঞতা, আর তারা পরিণত হয়েছিল শয়তানের দাসে। তাই বৃদ্ধি পেয়েছিল তাদের ভ্রষ্টতা। যেমন, আল্লাহ তা, আলা বলেন :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ـ

অর্থাৎ আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (সূরা জ্বীন : আয়াত-৬)

জাহেলী যুগের ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তৎকালীন আরবরা যখন কোন বিশাল মরু প্রান্তরে বন্য পশুদের এলাকায় গিয়ে পৌছত তখন ভূত-প্রেত, জিন ও শয়তানের আশঙ্কা করত এবং কাফেলার মধ্যস্থিত একজন দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে এই বলে আওয়াজ দিত- আমরা এ উপত্যকারা সরদারের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং উক্ত আওয়াজ তাদের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে গণ্য করত। এজন্যই জাহেলী যুগের লোকেরা বিভিন্ন পশু জবাই করে নিজেদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত, যাতে তার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে। তাদের কেউ ঘর নির্মাণ করলে কিংবা কোন কূপ খনন করলে জিনদের ক্ষতি রোধের লক্ষে পশু জবাই করত।

এভাবেই তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, কোন কোন পাথর, গাছপালা, জীবজন্তু এবং খনিজ পদার্থের এমন এমন গুণাবলি রয়েছে, যেগুলো তাদেরকে জিনের ক্ষতি এবং মানুষের বদনজর থেকে রক্ষা করে। তাই সেগুলো

দিয়ে তাবীজ বানিয়ে ব্যবহার করতে লাগল এবং সেগুলোর উপর পূর্ণ ভরসা করতে লাগল। মূলতঃ এর প্রধান কারণ ছিল আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস না থাকা। এ কারণেই তাদের তাবীজ ব্যবহার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাদের কাছে প্রচলিত তাবীজগুলো নিম্নরূপ–

১. আননাফরা এটা এক ধরনের তাবীজ যা জিন ও মানুষের বদনজর থেকে হিফাযতে থাকার জন্য শিশুদের হাত, পা কিংবা গলায় বেঁধে দেয়া হয়। আবার কখনও অপবিত্র জিনিস দ্বারা 'নাফরা' নামক তাবীজ দেয়া হতো। যেমন ঋতু স্রাবের ন্যাকড়া, হাড় ইত্যাদি। কখনও বা বিশ্রী নাম দিয়ে তাবীজ বানাত। যেমন قنفذ কনফয ইত্যাদি।

২. শৃগাল কিংবা বিড়ালের দাঁত।

৩. আকরা- এটা ঐ তাবীজকে বলা হয়, যা মহিলারা বাচ্চা না হওয়ার اَلْعَقْرَةُ কারণে কোমরে বাঁধে।

৪. ইয়ানজালীব- স্বামী রাগ করলে বা কোথাও রাগ করে চলে اَلْيَنْجَلِيْبُ গেলে তার মনকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী করার জন্য কিংবা তার ফিরে আসার জন্য যে তাবীজ ব্যবহার করা হয় তাকে ইয়ানজালীব বলে।

৫. দারদাবীস, دَرْدَبِيْسِ কারযাহালা, اَلْقَرْحَلَةُ তিয়ালা اَلتِّوْلَةُ হামরা- এসব হচ্ছে পূর্তি اَلْهَمْرَةُ কারার এবং اَلْكَرَارُ কাহলা اَلْكَحْلَةُ জাতীয় তাবীজ। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। কারার এবং হামরা-এর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মন্ত্র।

يَا كَرَارُ كَرِيْهِ يَا هَمْرَةُ اَهْمِرِيْهِ اَنْ اقْبَلَ فَسِرِيْهِ وَاَنْ اَدْبَرَ فَضَرِّيْهِ مِنْ فَرْجِهِ اِلَى فِيْهِ ـ

ইলাহিয়াত اِلٰهِيَّة। রবুবিয়্যত ও رُبُوْبِيَة বলাবাহুল্য যে, এই মন্ত্র আল্লাহর এর ক্ষেত্রে বড় শিরক।

এই অংশে এই ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এটা رُبُوْبِيَّةٌ কারণ, মন্ত্রের ক্ষতি ও উপকারের মালিক। আর এটিই হচ্ছে রাবুবিয়্যাতের শিরক।

অনুরূপভাবে, এই মন্ত্রে গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার কাছে দু'আ চাওয়া হয়েছে اَلِهَةٌ অংশে। সুতরাং, এটা ইলাহিয়াতের শিরক। আল্লাহ আমাদেরকে এসব শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

৬. খাছমা- এই তাবীজ রাজা-বাদশাহ কিংবা বিচারকের কাছে اَلْخَصْمَةُ যাওয়ার সময়, মামলায় জিতার জন্য আংটির নিচে, জামার বোতামে অথবা তরবারীর কভারে ব্যবহার করা হয়।

৭. আতফা- এটা ব্যবহারকারীর প্রতি মানুষের দয়া মায়া সৃষ্টি হবে اَلْعَطْفَةُ বলে ধারণা করা হয়।

৮. সালওয়ানা- এটা সাদা পূতি জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি তাবীজ। اَلسُّلْوَانَةُ বালুতে পুতে রাখলে কালো হয়ে যায়। অতঃপর সেখান থেকে উঠিয়ে তা ধৌত করে অস্থির মানুষকে পানি পান করালে সে শান্তি ফিরে পায় বলে মনে করা হয়।

৯. কাবলা- বদ নজর থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাদা পূতির এ اَلْقَبْلَةُ তাবীজ ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেয়া হয়।

১০. ওয়াদাআ- এটি পাথরের তাবীজ। বদ নজর থেকে হিফাযতে اَلْوَدْعَةُ থাকার উদ্দেশ্যে এটাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

১১. যাকে সাপে দংশন করেছে, তার গলায় স্বর্ণের অলংকার বেঁধে দেয়া, আর ধারণা পোষণ করা যে, এরকম লোকের গলায় সীসার অলংকার ঝোলানো হলে সে মারা যাবে।

১২. যাদু ও বদ নজরের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য খরগোশের হাঁড় ব্যবহার করা হয়।

১৩. তাহবীতা লাল ও সাদা রংয়ের তাগায় ছিগা তুলে মহিলার تَحْوِيْطَةٌ কোমরে বাঁধা হয় এবং তাতে পূতি ও রৌপ্যের চন্দ্র গেঁথে দেয়া হয়। ঐ তাবীজ তাদের ধারণা মতে বদ নজর থেকে হিফাযত করে।

এগুলি হচ্ছে, জাহেলী যুগের তাবীজ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ও কিছু কুসংস্কারের চিত্র। তাবীযের আকার আকৃতি বা ধারণা পরিবর্তন হলেও আকীদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এগুলোর অনেকটাই বর্তমান সমাজে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

জাহেলী যুগে যে ব্যক্তি বদনজর থেকে বাঁচার জন্য ঘোড়ার গলায় খেজুরের ছিলা লটকাত এবং বর্তমানে বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য যে জুতা লটকায় এত দু ভয়ের মধ্যে মূলত ঃ কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের হুকুম অভিন্ন। শায়খ নাসিরুদ্দিনে, আল-বানী مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ এই হাদীসকে সহীহ আখ্যায়িত করার পর তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তাবীজ ব্যবহারের এই গোমরাহী বেদুঈন-কৃষক থেকে শুরু করে অনেক শহুরে লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে।

এভাবে দেখা যায়, অনেক ড্রাইভার তাদের গাড়ির সামনের গ্লাসে তাগায় পূতি গেঁথে তা ঝুলিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে, বাড়ি অথবা দোকানের সামনে ঘোড়ার খুরের লোহার আংটি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ সকল জিনিস ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, বদনজর থেকে হিফাযতে থাকা। আসলে এ ধারণাগুলি তাওহীদ, শিরক ও মূর্তিপূজা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে মানব সমাজে রাসূল প্রেরণ করার পিছনে যে কারণ ছিল, তা হলো সমস্ত শিরক, মূর্তি পূজা, ইত্যাদি দূর করে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং, আজকের দুনিয়ায় মুসলিমদেরকে অজ্ঞতা, দ্বীন থেকে তাদের দূরত্ব ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি।

মুসলিমরা যে শুধু দ্বীনের বিরোধী কাজ করে তাই নয় বরং তাদের অনেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দালায়েল আল-খাইরাত গ্রন্থের লেখক শায়খ আল-জাযুলী বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ مَا سَجَعَتِ الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْحَوَائِمُ وَسَرَحَتِ الْبَهَائِمُ الْبَهَائِمُ وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ কবুতর গাইতে থাকে, পাখিরা ঘোরাফেরা করতে থাকে।

(আস্ সিলসিলাহ আস-সহীহা)

বর্তমানেও অনেক দেশে বই আকারে শিরকী তাবীজসমূহ ছাপানো হয় 'আকবর' নামক কক্ষপথে চন্দ্রের অবস্থানকালে সেই তাবীজগুলোতে বিচ্ছুর ছবি অঙ্কন করা হয়। এই তাবীজ সম্পর্কে ধারণা পোষণ করা হয় যে, এটা যার হাতে বাঁধা থাকবে তাকে বিচ্ছু দংশন করবে না।

আল্লামা আশ্ শকীরী তার রচিত 'আস্সুনান ওয়াল-মুবতাদা'আত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যে সমস্ত শিরকী তাবীজ বর্তমান যুগে প্রসার লাভ করেছে,

সেগুলোর মধ্যে একটি নিম্নে প্রদত্ত হলো। এ তাবীজ ঐ লোকের জন্য লেখা হয়, যার চক্ষু জ্বালা যন্ত্রণা করে।

তাবীজটিতে লেখা হয় :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ * اِنَّ فِى الْعَيْنِ رَمَدٌ * اِحْمَرَارٌ فِى الْبَيَاضِ * حَسْبِى اللّٰهُ الصَّمَدُ * يَا اِلٰهِىْ اِعْتِرَافِى * فِىْ اِعْزَالَكَ عَنْ وَلَد * عَافِ عَيْنَىْ يَا اِلٰهِىْ * اِكْفِنِىْ شَرَّ الرَّمَادِ * لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكُ * وَلَا كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থাৎ বলুন! আল্লাহ এক, চোখে জ্বালা যন্ত্রণা করছে, চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে গেছে, অমুখাপেক্ষী আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। প্রভু হে! আমি স্বীকার করছি, তুমি সন্তান থেকে পবিত্র, হে আল্লাহ! আমার চক্ষু ভালো করে দাও, চোখের জালা যন্ত্রণা দূর করে দাও। আল্লাহর কোন অংশীদার নেই, নেই তাঁর কোন সমকক্ষ।

লক্ষণীয় যে, উক্ত তাবীজ কুরআনের সাথে কবিতা মিশ্রিত করা হয়েছে, অথচ কুরআনকে কবিতা থেকে পবিত্র রাখা আমাদের কর্তব্য। (সুনান ও বিদ'আত)

আল্লামা আশশাকীরী كِتَابُ الرَّحْمَةِ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ নামক কিতাবে এরকম আরেকটি তাবীযের কথা উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা অন্ধের তদবীর করা হয় :

এই তা'বিজে শয়তানের নামে শপথ করা হয়েছে, সেটা শিরক ও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ আমাদেরকে কুফর ও শিরক থেকে হিফাযত করুন)।

শায়খ আরো একটি তাবীজের বর্ণনা দিয়েছেন। তাবীজটি নিম্নরূপ :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْقَرِيْنَةِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَ الْقَرِيْنَةِ تَضْلِيْلِ وَاَرْسَلَ عَلَى الْقَرِيْنَةِ طَيْرًا اَبَابِيْلَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلِ فَجَعَلَ الْقَرِيْنَةَ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلِ يَا عَافِىْ يَا شَدِيْدَ الطَّوْلِ ـ

এটা কি কুরআনের সাথে খেলা করা নয়? কুরআন বিকৃতি নয়? কুরআনের সাথে বিদ্রূপ করা নয়? এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, যারা বলেছেন : কুরআনের তাবীজ হারাম তাদের কথা অনেক শক্তিশালী এবং অগ্রাধিকার যোগ্য। কারণ,

এর দ্বারা ঐ সমস্ত শিরকের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, যেগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত একটু আগে আমরা পেশ করলাম। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায বলেন-যে সকল মন্ত্র রোগী ও শিশুদের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, সেগুলোও তামিমা-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই সেগুলো ব্যবহার করা হারাম হবে, এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এসব শিরক হিসেবে পরিণত হবে। কারণ, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন :

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللّٰهُ لَهُ. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً وَدَعَ اللّٰهِ لَهُ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ وَقَوْلُهُ النَّبِيِّ ﷺ الرِّقِى وَالْتَمَائِمِ وَالتِّوْلَةَ شِرْكٌ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ বা সমাধা করবেন না। যে ব্যক্তি কড়ির তাবীজ ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে শান্তি দেবেন। নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক কিংবা মন্ত্র, তাবীজ এবং বিশেষ ধরনের ভালোবাসার তাবীজ ব্যবহার করা শিরক। আর যে তাবীজ ব্যবহার করল, সে শিরক করল।

কুরআন হাদীসে তাবীজের ব্যাপারে এই মর্মে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা হারাম কিনা। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এটা হারাম। কারণ, প্রথমত: তামীমা প্রসঙ্গে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোই ব্যাপক। অতএব, এগুলো কুরআনের হোক কিংবা কুরআনের বাইরের হোক সকল তাবীজকেই শামিল করে।

দ্বিতীয়ত: শিরকের পথ বন্ধ করে দেয়ার নিমিত্তে সকল তাবীজ হারাম হওয়া উচিত। কারণ, কুরআনের তাবীজ বধ গণ্য হলে, সে পথে অন্যান্য তাবীযের আগমনও শুরু হবে। সেগুলো এবং কুরআনের তাবীজ একাকার হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এভাবে নির্দ্বিধায় সকল তাবীজের ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে এবং শিরকের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এটা সকলেরই জানা যে, যে সমস্ত মাধ্যম বা উপকরণ মানুষকে শিরক কিংবা গুনাহর দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

শায়খ মুহম্মদ ছালেহ বিন ওছায়মিন তাবীজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন : তাবীজ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. কুরআনের তাবীজ এবং
২. কুরআন ছাড়া অন্যান্য জিনিসের তাবীজ, যার অর্থ বোধগম্য নয়। প্রথম প্রকারের তাবীজের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল স্তরের আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

তাদের কেউ কেউ তাবীজকে এই বলে জায়েয গণ্য করেছেন যে, তা কুরআনের নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা ব্যবহার করা, তার দ্বারা মন্দ ও অকল্যাণ দূর করা কুরআনি বরকতের অন্তর্ভুক্ত।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ـ

অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য রহমত। সূরা ইসরা : আয়াত-৮২)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ـ

অর্থাৎ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। (সূরা সাদ : আয়াত-২৯)

আর কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ, নবী কারীম ﷺ থেকে সাব্যস্ত হয়নি যে, ওটা মন্দ দূর করার বা তা থেকে হিফাজতে থাকার শরীয়ত সম্মত মাধ্যম। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মূলনীতি হল التوفيق। তাওফীক। এটাই নির্ভরযোগ্য। তাই কুরআনের হলেও, তাবীজ ঝোলানো নাজায়েয। এভাবে রুগীর বালীশের নীচে রাখা, দেয়ালে ঝোলানো ইত্যাদি সবই নাজায়েয। এ ব্যাপারে শুধু এটুকুই শরীয়তসম্মত যে, রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য দুআ করা যাবে এবং সরাসরি তার উপর পাঠ করা যাবে, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন।

৬. পরিশিষ্ট

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাহায্যে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি শেষ হল। আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. তাবীজর ব্যবহার জাহেলী যুগ থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে এবং তাবীজ সম্পর্কে তাদের মধ্যে নানা রকমের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা প্রসিদ্ধ ছিল।

৩. তাবীজ ব্যবহারে 'আকীদাহ- বিশ্বাসে ক্রুটি এবং চিন্তাধারায় ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে।

৪. ব্যবহারকারী এবং তাবীযের বিষয়বস্তু অবস্থাভেদে কখনও বড় শিরক, আবার কখনও বা ছোট শিরক হয়।

৫. যাদুকর কিংবা তা সমতুল্য ভণ্ড লোকদের কারণে আজ পর্যন্ত মানব সমাজে তাবীজের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

৬. কল্যাণ বা ক্ষতিসাধন দূর করার জন্য তাবীজ শরীয়তসম্মত কোন মাধ্যম নয় এবং স্বাভাবিক মাধ্যমও নয়।

৭. সর্বসম্মত মত এই যে, কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নব্বীর আলোকে তাবীজ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

ঝাড়-ফুঁক

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন

৩. ঝাড়-ফুঁক

১. কুদৃষ্টি থেকে শিশুদের রক্ষার্থে যে দু'আ পাঠ করে ঝাড়তে হয়

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ : উ'য়ীযুকা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন, ওয়াহাম্মাতিন ওয়ামিন কুল্লি আ'ইনিন লাম্মাতিন।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতিকর চক্ষু (বদনজর) থেকে নাজাত চাই। (বুখারী (আধুনিক) ৩১২১ নং হাদীস, সহীহ আত্-তিরমিযী ২০৬০ নং হাদীস, ইবনু মাজাহ, ৩৫২৫ নং হাদীস)

২. জ্বর প্রতিষেধক

নবী করীম ﷺ বলেছেন, জ্বর হলো জাহান্নামের হাওয়ার কাঠিন্য, একে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী (আধুনিক) ৫৩০৩, ৫৩০৫ নং হাদীস, মুসলিম, আহমদ)

নবী করীম ﷺ আরো বলেন, যখন তোমাদের কেউ জ্বরে আক্রান্ত হয় তখন তার উপর ফজরের আগে তিন দিন পর্যন্ত ঠাণ্ডা পানি দাও। (নাসাঈ, হাকিম, তাবারানী)

৩. জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়ার দুটি দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল কাবীর আ'উযুবিল্লা-হিল 'আযীম মিন শাররি কুল্লি 'ইর্ক্বিন না'আ-রি ওয়ামিন শাররি হাররিন না-রি।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করলাম, মহান আল্লাহর নিকট রোগ থেকে রক্ত প্রবাহের ক্ষতি ও জাহান্নামের আগুনের ক্ষতি থেকে মুক্তি চাই।

(মিশকাত ১৫৫৪ নং হাদীস, হাদীসটি সনদ দুর্বল)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন ফজরের পরে ও সূর্য উঠার পূর্বে প্রবাহিত নালার নিকটবর্তী হয়ে পানিতে নেমে নিম্নের দু'আ পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মাশফি 'আবদাকা ওয়া সাদ্দিক্ব রাসূলাকা।

অর্থ : আল্লাহর তা'আলার নামে শুরু করলাম, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাকে সুস্থ করে দাও এবং তোমার রাসূলকে সত্য বলে প্রমাণিত করে দাও।

তিন দিন তিনবার করে পানিতে নেমে উক্ত দু'আ পাঠ করবে। যদি তা (তিন দিন) ভালো হয়ে যায় তবে তা হলো, নতুবা পাঁচদিন এরূপ করবে। তাতেও সুস্থ না হলে সাতদিন, অবশেষে নয়দিন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা নয়দিনের অধিক থাকবে না। (তিরমিযী, আহমদ, মিশকাত ১৫৮২ নং হাদীস, সনদ দুর্বল)

৪. পেটের ব্যথা হলে যা করতে হয়

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমাকে নবী করীম ﷺ দেখতে পেলেন আমি পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে শুয়েছিলাম তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছ? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং সালাত আদায় কর কেননা নামাযেই এর চিকিৎসা রয়েছে। (ইবনে মাজাহ, আহমদ)

৫. মানুষের কুদৃষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা হি আরক্বীকা মিন কুল্লি শাইয়্যিন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনি হা-সিদিন। আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লা-হি আরক্বীকা।

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ছি ঐ সকল বস্তু থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়। সকল নাফসের ক্ষতি থেকে ও বিদ্বেষী চক্ষু থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ছি।

(মিশকাত ১৫৩৪ নং হাদীস, মুসলিম)

৬. ফোঁড়া এবং ক্ষতধারী ব্যক্তিকে ঝাড়ার দুটি দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীক্বাতি বা'দিনা লিইউশফা– সাক্বীমুনা বিইযনি রাব্বিনা।

অর্থ : আমাদের যমীনের মাটি ও আমাদের মুখের থুথু দ্বারা আল্লাহ্‌র নামে ও অনুমতিক্রমে আরোগ্য লাভ করতে হবে।

(বুখারী (আধুনিক) ৫৩২৫ নং হাদীস, সহীহ আবূ দাউদ ৩৫২১ নং হাদীস, মুসলিম)

ডান হাত দ্বারা ক্ষতস্থানে হাত বুলাবে (মাসেহ করবে) আর নিম্নের দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاْسَ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বানাস আযহিবিলবাস ইশকি আনতাশ্‌শা ফি লা-শিফা-য়া ইল্লা শিফাযুকা শিফা-য়াল্লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ : হে আল্লাহ! মানুষের পালনকর্তা! তুমি কষ্ট দূর কর। সুস্থ করে দাও, তুমিইতো সুস্থতা দানকারী, তোমার সুস্থতা ছাড়া আ কোন শিফা নেই, তোমার শিফা এমনই যা সমস্ত ব্যাধি দূর করে। (বুখারী, আল-আযকার নববী ১২৩ পৃষ্ঠা)

৭. সাপ বিচ্ছু ইত্যাদিতে কাটলে যেভাবে ঝাড়তে হবে

একদা কোন এক গোত্রের লোক এসে মুসলমানদের বলেছিল যা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

"হে লোক সকল! আমাদের সর্দারকে বিচ্ছু কাটলে তার বিষ দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার কোনই উপকার হয়নি। তোমাদের কারো এ বিষয়ে জানা আছে কি? তখন মুসলমানদের মধ্যে একজন বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে থাকি। (হাদীসের শেষাংশে বলা হচ্ছে) অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন এবং রোগীর ক্ষতস্থানে মুখের থুথু দিয়ে সূরা ফাতিহা (আলহামদুলিল্লাহ সূরা) পাঠ করতে লাগলেন। এর সাথে সাথে রশিতে গিরা দিতে লাগলেন। ফলে বিষ দূর হয়ে গেল এবং সর্দার উঠে হাঁটতে লাগল। তার আর কোন ব্যথা-বেদনা থাকল না।" (বুখারী, মুসলিম)

নবী করীম ﷺ-কে একদা বিচ্ছু কামড় দিলে তিনি লবণ মিশ্রিত পানির পাত্র চাইলেন, অতঃপর ক্ষতস্থানে লাগলেন এবং "কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ" কুল আউ'যু বিরাব্বিল ফালাক্ব" ও কুল আ'উযুবি রাব্বিন নাস" পড়লেন, অবশেষে তিনি শান্তিবোধ করলেন। (তিরমিযী)

৮. সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে নিরাপদে থাকার দু'আ

প্রতি সন্ধ্যাকালে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতে হবে–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমাতিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্ব।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি ক্ষতিকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

(সহীহ আত-তিরমিযী ৩৬০৪ নং হাদীস, মুসলিম, আহমদ)

৯. দেহে ব্যাথা হলে যেভাবে ঝাড়তে হবে

নবী করীম ﷺ বলেছেন, তুমি তোমার হাতকে দেহের ব্যথার স্থানে রাখ এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বল ও সাতবার নিম্নের দু'আ পাঠ কর।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিইযযাতিল্লা-হি ওয়াক্বদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়াউহা-যির।

অর্থ : মন্দ বস্তুর মধ্যে থেকে আমি যে কষ্ট পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার তাঁরই নিকট মুক্তি চাই। (মিশকাত ১৫৩৩ নং হাদীস, মুসলিম)

তিরমিযী শরীফ থেকে প্রমাণিত, তোমার হাত রাখ অতঃপর উপরিউল্লেখিত দু'আ পড়। আবার হাত উঁচু কর। আবার হাত রেখে দু'আ পড়। এমনিভাবে বিজোড় বার অর্থাৎ তিন, পাঁচ, সাত অথবা এর চেয়ে অধিক পরিমাণ পড়।

১০. আগুনে পোড়া বা কাটার জন্য যেভাবে ঝাড়বে

اَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شَافِىَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আযহিবিল বা'স রাব্বান্না-স ইশফি আনতাশ্‌শা-ফী লা-শাফীয়া ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে মানবের পালনকর্তা! কষ্ট দূর করে দাও। শিফা দান কর। তুমিই শিফা দানকারী। তুমি ছাড়া কোন শিফা দানকারী নেই। (নাসাঈ, আহমদ, তাবারানী)

১১. কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে যা পাঠ করতে হয়

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি আন্নী মাসসানিয়ায দররু ওয়াআনতা আরহামুর রা-হিমীন।

অর্থ : দয়াময় প্রভু! আমাকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেছে আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮৩)

১২. অস্থিরতায় আক্রান্ত হলে যে দু'আ পাঠ করতে হয়

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুস। রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহি জাল্লালতাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা বিল 'ইযযাতি ওয়াল জাবারূত।

অর্থ : পবিত্র মালিক (সত্যিই) অত্যন্ত পবিত্র এবং ফেরেশতাগণের জিবরাঈল (আ)-এর প্রতিপালক। তুমি আসমান ও যমীনকে তোমার সম্মান ও ক্ষমতা বলে শক্তিশালী করেছ। (ইবনুস সুন্নী)

১৩. পাগল ব্যক্তিকে যেভাবে ঝাড়বে

নবী করীম ﷺ বলেছেন, পাগল ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যায় তিনদিন পর্যন্ত ঝাড়বে। যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করা শেষ হবে, তখন মুখের থুথু একত্রিত করে থুথু দিবে। (আবূ দাউদ, নাসাঈ)

১৪. পাগল এবং কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّىءِ الْاَسْقَامِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুমা-মি ওয়াসাইয়ি-ইল আসক্বা-মি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিকট শ্বেত, পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে। (সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৪ নং হাদীস)

১৫. প্রস্রাব বন্ধ বা মূত্রনালিতে পাথর হলে যে দু'আ পড়তে হয়

رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ، اِغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ.

উচ্চারণ : রাব্বুনাল্লাহুল্লাযী ফিস্সামা-য়ি তাক্বাদ্দাসাস্মুকা আমরুকা ফিস্সামা-য়ি ওয়াল আরদি, কামা-রাহমাতুকাফিস্সামা-য়ি, ফাজ'আল রাহমাতাকা ফিল আরদি, ইগফিরলানা হুবানা ওয়াখাত-ইয়া-না-আনতা রাব্বুত্তাইয়্যিবীনা আনযিল রাহমাতাম মির রাহমাতিকা ওয়াশিফা-য়াম মিন শিফায়িকা 'আলা হাযাল ওয়াজ'য়ি।

অর্থ : সেই আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা। যিনি আসমানে রয়েছেন, তোমার নাম পবিত্র। তোমার বিধান যমীনে ও আসমানে নিহিত রয়েছে। যেমন তোমার রহমত রয়েছে আকাশের মধ্যে, তেমনিই তুমি তোমার রহমতকে যমীনে প্রসারিত কর। আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর। তুমি সকল সৎ ব্যক্তিদের পালনকর্তা, তুমি তোমার শিফা ভাণ্ডার হতে শিফা এবং রহমতের ভাণ্ডার হতে রহমত দান কর এ রোগের ওপর। (যঈফ আবূ দাউদ ৩৮৯২ নং হাদীস, নাসাই)

১৬. চক্ষু রোগে যে দু'আ পাঠ করতে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصْبَهَا.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আল্লা হুম্মা আযহিব হাররাহা ওয়াবারদাহা ওয়াওয়াসবাহা।

অর্থ : আল্লাহর নামে দু'আ করছি, হে আল্লাহ! চোখের গরম, চোখের ঠাণ্ডা এবং চোখের স্থায়ী ব্যথা দূর করে দাও। (নাসাই, হাকিম)

১৭. চক্ষুর সুস্থতা রক্ষার তদবীর

নবী করীম ﷺ চক্ষুদ্বয়কে রোগমুক্ত রাখার জন্য ঘুমের সময় সুরমা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর একটি সুরমাদানী ছিল, তিনি তা থেকে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা দিতেন।

(ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

ইবনে মাজাহ থেকে আরো প্রমাণিত হয়, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের চোখে সুরমা দেয়া উচিত, কেননা তা চোখকে পরিষ্কার করে এবং চুল জন্মায়।

১৮. মানুষের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষার্থে দু'আ

আবূ সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মুক্তি চেয়েছেন চোখের বদনজর হতে (বিভিন্ন দু'আ পাঠ করে)। কিন্তু যখনই সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব নাযিল হলো, তিনি সব ছেড়ে দিয়ে এ দুই সূরাই পড়তেন (বিশেষ করে সালাত আদায়ের পর ও শোয়ার সময়)। (তিরমিযী, নাসাই , ইবনে মাজাহ)

১৯. নিজের বদনজর থেকে অন্যকে রক্ষার দুটি দু'আ

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : মা-শা-য়াল্লাহু লাকুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নেই।

(ইবনুস সুন্নী, আল-আযকার নববী ২৮৩ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ নিজের চোখ দ্বারা কোন কিছুর অনিষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করলে তখন তিনি নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক ফীহি।

অর্থ : হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত বর্ষণ কর।

(ইবনুল সুন্নী, আল-আযকার নববী ২৮৩ পৃষ্ঠা)

২০. কঠিন রোগে মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় দুটি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আইহনী মা-কা নাতিল হায়াতু খাইরাললী। ওয়াতাওয়াফফানী ইযা-কা-নাতিল ওয়াফা তু খাইরাললী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার বেঁচে থাকাটা যদি উত্তম মনে কর তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, আর আমার মৃত্যু হওয়াকে যদি কল্যাণ মনে কর তাহলে আমাকে মৃত্যু দাও। (বুখারী (আধুনিক) ৫৯০৫) নং হাদীস)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ। লাইলা হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু। লাইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি এক। আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই, রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ব্যতীত কারো কিছু করার নেই। (তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, ইবনে মাজাহ)

২১. জ্বিন ও শয়তানের ভয়ে তিনটি দু'আ

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ .

উচ্চারণ : রাব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাযা-তিশ শাইতা-নি ওয়াআ'উযুবিকা রাব্বি আন ইয়াহদরুন।

অর্থ : হে প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট শয়তান (ভূত-প্রেত)-এর আক্রমণ এবং আমার নিকট তাদের হাজির হওয়া থেকে হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ .

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন গাযাবিহী ওয়া ইকা বিহী ওয়াশারবি 'ইবা দিহী ওয়ামিন হামাযা তিশ শাইতোনি ওয়াআইইয়াহযুরুন।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর পূর্ণ বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর গযব ও শাস্তি এবং তাঁরই সৃষ্টজীব (ভূত-প্রেত) এর অত্যাচার, ক্ষতি ও শাইতানের ধোঁকা ও উপস্থিতি থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (মিশকাত ২৪৭৭ নং হাদীস)

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর পূর্ণ বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর গযব ও শাস্তি এবং তাঁরই সৃষ্টজীব (ভূত-প্রেত) এর অত্যচার, ক্ষতি ও শয়তানের ধোঁকা ও উপস্থিতি হতে মুক্তি চাচ্ছি। (মিশকাত ২৪৭৭ নং হাদীস)

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ وَمِنْ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিওয়াজহিল্লা-হিল কারীম ওয়াবিকালিমা তিল্লা হিত তাম্মাতিললাতী লা-ইউজা ও য়িযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফাজিরুন মিন শাররি মা খালাক্বা ওযারাবা ওয়াবারায়া ওয়ামিন শাররি মা ইযানযিলু সামায়ি ওয়ামিন শারকি মা ইয়া রুজু ফীহা ওয়ামিন শাররি মা যারায়া ফীল আরযি ওয়ামিন শাররি

মা ইয়াখরুজু মিনহা ওয়ামিন শাররি ফিতানিল লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়ামিন শাররি কুল্লি তারিক্বিন ইল্লা তারিক্বান ইয়াতরুকু বিখাইরিন ইয়া–রাহমানু।

অর্থ : পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহর ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে মুক্তি চাই, যা কোন নেককার বা বদকার অতিক্রম করতে পারে না এবং ঐ যাবতীয় বস্তু থেকে যা আল্লাহ খারাপ ও নিকৃষ্ট বস্তুর ক্ষতি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা আসমান থেকে নেমে আসে ও আসমানে চড়ে, যা যমীনে সৃষ্টি করেছেন, যমীন থেকে বেরিয়ে আসে, এবং প্রত্যেক রাত ও দিনের অনিষ্ট থেকে মুক্তি চাই, এবং প্রত্যেক খারাপ পথিক থেকে মুক্তি চাই, ভালো পথিক থেকে নয়। হে দয়াময়! (নাসাঈ, আহমদ, তাবারানী)

২২. জ্বীন আক্রমণ করলে যা করতে হয়

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লাহি মিনকা। (তিনবার পড়বে।)

অতঃপর বলবে–

اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ.

উচ্চারণ : আল'আনুকা বিলা' নাতিল্লা-হিত তা-ম্মাতি।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার (অনিষ্ট) থেকে মুক্তি চাই, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ অভিশাপ তোমাকে অভিশপ্ত করুন। (মুসলিম)

২৩. জ্বীনে আছরকৃত ব্যক্তিকে যেভাবে ঝাড়তে হয়

১. সূরাতুল ফাতিহা যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

১. আলিফ-লাম-মীম ২. যা-লিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফীহি, হুদাললিল মুত্তাক্বীন ৩. আল্লাযীনা ইউমিনূনা বিলগাইবি ওয়াইউক্বীমূনাস সালাতা ওয়ামিম্মা-রাযাক্বনা হুম ইউনফিকুন ৪. ওয়াল্লাযীন ইউমিনূনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন ক্বাবলিকা ওয়াবিল আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন ৫. উলায়িকা 'আলা হুদামমির রাব্বিহিম ওয়াউলায়িকা হুমুল মুফলিহুন। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১-৫)

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

৩. ওয়াইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদুল লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহিম ইন্না ফী খালক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলা ফিল লাইলি ওয়ন্নাহা রি ওয়াল ফুলকিল্লাতী তাজরী ফিলবাহরি বিমা ইয়ানফা'উন্নাসা ওয়ামা আনযালাল্লাহু মিনাসসামায়ি মিমমা য়িন ফাআহইয়া-বিহিল আরদা বা'দা মাউতিহা ওয়াবাসসাফীহা মিন কুল্লি দা-ববতিউ ওয়াতাসরীফির রিইয়্যা হি ওয়াসসাহা-বিল মুসাখখারি বাইনাস সামায়ি ওয়াল আরদি লাআ-য়া-তিললি ক্বাউমিই ইয়া'ক্বিলুন।
(সূরা বাক্বারা : ১৬৩-১৬৪)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ -

৪. আয়াতুল কুরসী। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৫)

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْامَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَاوَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَاوَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

৫. লিল্লাহি মা-ফিস সামা ওয়া-তি ওয়ামাঃফিল আরদি, ওয়া-ইন তুবদ মা-ফি আনফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহা-সিবকুম বিহিল্লাহ। ফাইয়াগফিরু লিমাই ইয়াশা-য়ু ওয়াইউ আযযিবু মাইইয়াশা-য়ু ওয়াল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। ....

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

৬. শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া ওয়াল মালা-য়িকাতু ওয়াউলুল 'ইলমি ক্বা-য়িমাম বিলক্বিসতি লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল 'আযীযুল হাকীম।

(সূরা : আলে ইমরান : আয়াত-১৮)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًاوَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

৭. ইন্না রাব্বাকুমুল্লা হুল্লাযী খালাক্বাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা ফী সিত্‌তাতি আইইয়্যা-মিন ছুম্মাস তাওয়া'আলাল 'আরশি ইউগশিল লাইনাল নাহারা ইয়াতলুবুহু হাসীসাউ ওয়াশশামসা ওয়াল ক্বামারা ওয়াননূজুমা মুসাখখারাতিম বিআইমরিহ, আলা-লাহুল, খালকু ওয়াল আমরু, তাবা-রাকাল্লা-হু লাব্বুল 'আ-লামীন। ৫৪. উদ' উরাব্বাকুম তাদাররু আউ ওয়াখফাইয়াতান ইন্নাহ লা-ইউহিব্বুল মু' তাদীন ৫৫. ওয়ালা তুফসিদু ফিল আরদি বা'দা ইসলা হিহা ওয়াদ' 'উহু খাওফাউ ওয়াতামা'আ, ইন্না রাহমাতাল্লাহি ক্বারীবুম মিনাল মুহসিনীন

(সূরা আল 'আরাফ : আয়াত-৫৪-৫৬)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ـ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

৮. ফাতা'আলাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু, লাইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল 'আরসিল কারীম ওয়ামাই ইয়াদ'উ মা'আল্লা হি ইলাহান আখারা লাবুরহা নালাহু বিহী ফাইন্নামা-হিসা বুহু 'ইনদা রাব্বিহী ইন্নাহু লা-ইউফলিহুল কা-ফিরুন । ওয়াকুরাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়াআনতা খাইরুর রাহিমীন।

(সূরা মু'মিনূন : আয়াত-১১৬-১১৮)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ـ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ـ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ـ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ـ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِالْكَوَاكِبِ ـ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ـ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ـ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

৯. ওয়াস সাফফাতি সাফফান ১. ফাযযা জিরাতি যাজরান ২. ফাততা লিয়াতি যিকরানা ৩. ইন্না ইলা-হাকুম লাওয়া হিদ ৪. রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়ারাব্বুল মাশারিক্ব ৫. ইন্না-যাইইয়ান্নাস সামায়াদদুন ইয়া বিযাইনাতিনিল কাওয়াকিব ওয়াহিকজাম মিন কুল্লি শাইতা নিম মারিদ ৬. লাইয়াসসাম্মা'উনা ইলাল মালায়িল 'আলা ওয়ায়িক জাফুনা মিন কুল্লি জানেব ৭. দুহুরাও ওয়ালাহুম আযাবুত ওয়াসিব ৮. ইলা মান খাতিফাল খাতফাতা ফাআতবা'আহু শিহাবুন সাক্বি ৯. ফাস্ফাল আহুম আশাদদু খালক্বান আম্মান খালাক্বনা ইন্না খালাক্বনা হুম মিন তীনিল লা-যিব। (সূরা সাফফাত : আয়াত-১-১১)

وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَاوَلَدًا-

১১. ওয়াআন্নাহু তা'আলা জাদ্দু রাব্বিনা মাততাখাযা সাহিবাতাউ ওয়ালা ওয়ালাদা। (সূরা জ্বীন : আয়াত-৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

১২. সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

১৩. সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

১৪. সূরা নাস

④

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

যাদু টোনা

মূল

শায়খ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী

সম্পাদনায়

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সৌদি আরব

প্রকাশনায়
বায়তুস সালাম
রিয়াদ, সৌদি আরব

বাংলাদেশ প্রকাশ
পিস পাবলিকেশন

৪. যাদু টোনা

১. যাদুর পরিচয়

যাদুর আভিধানিক অর্থ

আল্লামা আজহারী বলেন : মূলত : যাদু হলো বস্তুর বাস্তবতাকে অবাস্তবে পরিণত করা।

জগতখ্যাত জ্ঞানী লাইছ বলেন– যাদু হলো এমন কাব্য যার মাধ্যমে শয়তানের নিকট গমন করে হয়ে তার সাহায্য নেয়া হয়।

ইবনে ফারেস বলেন– অসত্যকে সত্য বলে প্রদর্শন করাকেই যাদু বলা হয়।

যাদুর পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী বলেন : শরীয়তের পরিভাষায় যাদু এমন নির্ধারিত বিষয়কে বলে যার কারণ গোপন রাখা হয় এবং এর বাস্তবতার বিপরীত কিছু দেখানো হয়। আর তা ধোঁকা ও মিথ্যার আশ্রয়ের শামিল।

(আল মিসবাহুল মুনীর : আয়াত-২৬৮)

ইবনে কুদামা বলেন : যাদু হলো এক গিরা-বন্ধন, মন্ত্র ও এমন কথা যা যাদুকর পড়ে অথবা লিখে অথবা এমন কোন কাজ করে যার মাধ্যমে যাদুকৃত ব্যক্তির দেহ, মন ও মস্তিষ্কের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর তার বাস্তব ক্রিয়া রয়েছে। অতএব এর দ্বারা মানুষকে হত্যা করা হয়, রোগাক্রান্ত করা হয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটানো হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি বা পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা লাগিয়ে দেয়া হয়। (আল-মুগানী : ১০/১০৪)

কাজেই যাদুর প্রকৃতি হলো শয়তান ও যাদুকরের মাঝে এমন এক চুক্তি হয় যে, যাদুকর কতিপয় হারাম বা শিরকী কাব্যে নিমগ্ন হবে বিনিময়ে শয়তান তাকে সহযোগিতা করবে ও তার অনুসরণ অনুকরণ করবে।

শয়তানের নিকটতম হওয়ার জন্য যাদুকরদের কিছু পদ্ধতি

যাদুকরদের কেউ কেউ কুরআনে কারীম পায়ের নিচে দলিত করে পায়খানায় নিয়ে যায়, আবার কেউ ময়লা বা জঘন্য জিনিস দ্বারা কুরআনের আয়াত লিখে থাকে, কেউ আয়াতকে উভয় পায়ের নিচে লিখে, কেউ সূরা ফাতেহাকে উল্টাভাবে লিখে, কেউ আয়াতের উপর বসে, তাদের কেউ বিনা ওযুতে সালাত আদায় করে, কেউ সর্বদা নাপাক থাকে, তাদের কেউ আল্লাহর নাম না নিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যে যবাই করে যবাইকৃত পশুটি শয়তান নির্ধারিত স্থানে রাখে, কেউ তারকাকে সম্বোধন করে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উদ্দেশ্যে সিজদা

করে। কেউ কেউ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য মা- বা মেয়ের সাথে যিনা করে এবং কেউ কেউ আরবি নয় এরূপ অস্পষ্ট কুফরী কালামের চিত্র বা নক্সা লিখে দেয়।

এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে জ্বীন, শয়তান যাদুকরকে চুক্তি বা বিনিময় ছাড়া কোন সাহায্য করে না বা তার কোন সেবা করে না। যাদুকর যত বড় কুফরীতে লিপ্ত হতে পারবে শয়তান তার ততবেশি অনুগত হবে ও তার তত্রুত কাজ সম্পন্ন করে দিবে।

পক্ষান্তরে যাদুকর যদি শয়তানের পছন্দমত কুফরী কাজে ভুল বা উদাসীনতা করে তবে সে তার সেবা থেকে বিরত হয় ও তার অবাধ্য হয়ে যায়, সে আর তার বাধ্য থাকে না। মূলত: শয়তান ও যাদুকর পরস্পরের সহযোগী উভয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় মিলিত হয়।

২. কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যাদু

জ্বীন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ : জ্বীন ও যাদুর মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে; বরং জ্বীন ও শয়তানই হলো মূলত: যাদুর প্রধান চালিকা শক্তি। কিছু সংখ্যক লোক জ্বীনের অস্তিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং যাদুও অস্বীকার করেছে। তাই এখানে এসবের অস্তিত্বের প্রমাণগুলো উল্লেখ করা হলো ।

প্রথমত : কুরআন দ্বারা প্রমাণ

১. মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

অর্থ : স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরাআন তিলাওয়াত শুনছিল। (সূরা আহকাফ : আয়াত-২৯)

২. মহান আল্লাহ আরো বলেন–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا .

অর্থ : "হে জ্বীন ও মানবজাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকেই নবী-রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং বর্তমানের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করত?"

(সূরা আনআম : আয়াত-১৩০)

৩. আল্লাহ আ'আলা আরো বলেন–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ ـ

অর্থ : "হে জ্বীন ও মানুষজাতি! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা সক্ষম হবে না, শক্তি ব্যতিরেকে।" (সূরা আর রহমান : আয়াত-৩৩)

৪. আল্লাহ ঘোষণা করেন–

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ـ

অর্থ : "বল : আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে : আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।" (সূরা জ্বীন : আয়াত-১)

৫. আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন–

وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ـ

অর্থ : "আর কিছু সংখ্যক মানুষ কতিপয় জ্বীনের আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা জ্বীনদের আত্ম গৌরব বৃদ্ধি করে দিত।" (সূরা জ্বীন : আয়াত-৬)

৬. আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

অর্থ : "শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, অতএব এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"

(সূরা আল মায়েদা : আয়াত-৯১)

৭. আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। (সূরা নূর : আয়াত-২১)

কুরআনে কারীমে এ বিষয়ে অনেক দলীল প্রমাণাদি রয়েছে। আর একথা সকলেই জানে যে, কুরআনে কারীমে একটি সূরাই সূরায়ে জ্বীন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আর প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, জ্বীন একবচন শব্দটি কুরআনে কারীমে ২২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর "আল-জান" বহুবচন শব্দটি সাতবার এবং اَلشَّيْطَانُ শব্দটি ৬৮ বার আর اَلشَّيَاطِيْنَ বহুবচন শব্দটি সতের বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা জ্বীন ও শয়তান প্রসঙ্গে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : হাদীস দ্বারা প্রমাণ

১. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : আমাকে রাসূল ﷺ বললেন : "আমি দেখেছি যে, তুমি ছাগল এবং মরুভূমিকে ভালোবাস। কাজেই তুমি যখন ছাগলের সাথে মরুভূমিতে থাকবে তখন তুমি সালাতের জন্য আযান দিবে তখন আযানের আওয়াজ অনেক উঁচু করবে। কেননা নিশ্চয়ই মুয়াজ্জিনের ধ্বনি জ্বীন, মানুষ এবং অন্য যারাই শ্রবণ করবে শেষ বিচার দিবসে তার জন্যে সাক্ষ্য দিবে।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৬৮, বুখারী : ২/৩৪৩ ফাতহ, নাসায়ী : ২/১২ ও ইবনে মাজাহ : ১২৩৯)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর আমরা রাসূল ﷺ কে হারিয়ে ফেললাম। এ বিষয়ে আমরা উপত্যকায় এবং বিভিন্ন গোত্রে খুঁজতে লাগলাম; কিন্তু না পেয়ে আমরা মনে করলাম যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উধাও বা অপহরণ করা হয়েছে। এরপর সেই রাত খুব খারাপ রাত হিসেবে কাটালাম। যখন ভোর হলো হঠাৎ দেখি হেরা গুহার দিক থেকে আসছেন। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আমরা না পেয়ে অনেক খুঁজেছি তবুও আপনাকে পাইনি? এরপর রাতটি খুব খারাপ কাটিয়েছি।

নবী করীম ﷺ বললেন : "জ্বীনের এক আহ্বায়ক আমার নিকট আগমন করলে আমি তার সাথে চলে গেলাম এবং তাদেরকে আমি কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি।"

রাবী বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে চললেন সেই স্থানে এবং সেখানে আমাদেরকে তিনি জ্বীন সম্প্রদায়ের নিদর্শনগুলো ও তাদের আগুন জ্বালানোর চিহ্নসমূহ দেখালেন। তারা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন তাদের খাবার সম্পর্কে। জবাবে তিনি বলেন : তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই হাড় যার উপর (যবাই করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তোমাদের হাতের নিকট থাকে যাতে গোশত না হয় এবং তোমাদের পশুর গোবর তা তোমাদের জন্যে খাবার।

অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন : "অতএব তোমরা তা দিয়ে এস্তেঞ্জা করো না। নিশ্চয় তা হলো তোমাদের ভাই জ্বীনদের খাবার।" (মুসলিম : ৪/১৭০)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নিজ বর্ণনায় বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবাদের এক দলের সাথে উকাজ বাজারের দিকে গমন করেন। ইতিমধ্যে শয়তানদের ও আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, তাদের ওপর তারকা অগ্নিশিখা নাযিল হয়। যার ফলে তারা স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে। উপস্থিত শয়তানরা জিজ্ঞেস করে : তোমাদের কি হয়েছে? তারা জবাব দেয় : আমাদের ও আকাশের খবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের প্রতি তারকা অগ্নিশিখা নাযিল করা হয়েছে। তারা শুনে বলে : তোমাদের ও আকাশ খবরের মাঝে স্বাভাবিক কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি; বরং বড় ধরনের কিছু ঘটে গেছে। কাজেই তোমরা বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ কি সে বাধা– যা তোমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে ঘটে গেছে। অতএব তারা তেহামা অভিমুখে নবী ﷺ-এর দিকে ফিরে যায়।

এমতাবস্থায় তিনি উকাজ বাজার অভিমুখে যাওয়ার সময় নাখলা উপত্যকায় সাহাবাদেরকে নিয়ে ফজর সালাত আদায় করেছেন। যখন শয়তানরা (ফজরের) কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করল, তখন তারা তা আরো মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। অতঃপর তারা বলল : আল্লাহর কসম এটিই আমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করে। কাজেই তারা তখন সেখান হতে স্বীয় জাতির নিকট ফিরে এসে বলে : হে আমাদের জাতি! আমরা নিশ্চয়ই এমন এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সরল পথের দিশারী। সুতরাং তার প্রতি আমরা ঈমান এনে ফেলেছি। আর আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করব না।

এরপর আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ এর প্রতি নাযিল করেন–

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا.

অর্থ : "বল : আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে : আমরা তো এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি।" (সূরা জিন : আয়াত-১)

নিশ্চয় তাঁর প্রতি নাযিল হয় জ্বীনের কথা।

(বুখারী : ২/২৫৩ ফাতহসহ ও মুসলিম : ৪/১৬৮ নববীসহ শব্দগুলো বুখারীর।)

৪. সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্তের মতো চলাচল করে।"

(বুখারী : ৪/২৮২ ফাতহসহ, মুসলিম : ১৪/১৫৫ নববীসহ।)

৫. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নিজ বর্ণনায় বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি হয় নূর থেকে, আর জ্বীনকে সৃষ্টি করা হয় অগ্নিশিখা থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয় তাই দিয়ে যা তোমাদেরকে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।" (মুসনাদে আহমদ : ৬/১৫৩,১৬৮ ও মুসলিম : ১৮/১২৩ নববীসহ)

৬. আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এমন কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না যাকে শয়তান আঘাত করে না। কাজেই শয়তানের আঘাতের ফলে সে সন্তান জন্মের সময় চীৎকার করে। তবে ঈসা ও তাঁর মাতা ছাড়া।" (বুখারী : ৮/২১২) ফাতহসহ ও মুসলিম : ১৫/১২০ নববীসহ)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : "যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খায় সে যেন ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখন যেন ডান হাতেই পান করে। কেননা নিশ্চয়ই শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতেই পান করে।" (মুসলিম : ১৩/১৯১ নববীসহ)

৮. আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সৎ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে, কাজেই যে ব্যক্তি এমন কিছু দেখা যা তার অপছন্দ হয়, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম বলে ফুঁক দেয়, তবে তাকে অবশ্যই তা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী : ১২/২৮৩ ফাতহসহ ও মুসলিম : ১৫/১৬ নববীসহ)

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তির বিবরণ দেয়া হলো যে, পূর্ণ রাত্রি সকাল পর্যন্ত ঘুমায়। তিনি বলেন : সে এমন ব্যক্তি যার উভয় কানে বা এক কানে শয়তান পেশাব করে দেয়। (বুখারী : ৩/২৮ ফাতহসহ ও মুসলিম : ৬/৬৪ নববীসহ)

১০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ হাই তোলে, তখন সে যেন নিজ হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে। (মুসলিম : ১৮/১২২ নববীসহ ও দারমী : ১/৩২১)

এ বিষয়ে আরও অসংখ্যা হাদীস রয়েছে। কাজেই এখান থেকে প্রমাণিত হলো যে, জ্বীন এবং শয়তানের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য। এর মধ্যে কোন সন্দেহের সুযোগ নেই।

যাদুর অস্তিত্বের দলীল

কুরআন দ্বারা দলিল

১. মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তাই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফুরী করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা মানুষদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রতি নাযিল হয়েছিল তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিত না, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই

তুমি কুফরী করো না; অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত এবং তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকারে আসে না এবং নিশ্চয় তারা জানে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে আখিরাতে কোনই অংশ নেই এবং যার বিনিময়ে তারা যে স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানতো! (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ مُوسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ .

অর্থ : মূসা বললেন : তোমরা কি এ হক প্রসঙ্গে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছল? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না! (সূরা ইউনুস : আয়াত-৭৭)

৪. মহান আল্লাহ্ আরো ঘোষণা করেন–

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ، وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

অর্থ : অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা (আ) বললেন : যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বাতিল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন না। আর আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর ধারণা করে। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮১-৮২)

৫. তিনি আরো ইরশাদ করেন–

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْۤا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى.

অর্থ : মূসা (আলাইহিস সালাম) তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম : ভয় পেও না, তুমিই প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না।

(সূরা ত্বো-হা : আয়াত-৬৭-৬৯)

৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ ـ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

অর্থ : তখন আমি মূসা -এর নিকট এ ওহী প্রেরণ করলাম : তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আ.) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাঠে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। যাদুকররা তখন সিজদায় লুটে পড়ল। তারা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করল : আমরা বিশ্ব পালনকর্তার প্রতি অকপটে ঈমান গ্রহণ করলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো– কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? জবাবে তারা বলল) মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি।

(সূরা আরাফ : আয়াত ১১৭-১২২)

৬. মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ–

অর্থ : বল : আমি আশ্রয় চাই ঊষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে এবং ক্ষতি হতে অন্ধকার রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন হয় এবং গিরায় ফুঁকদান কারিণীর এবং হিংসুকের ক্ষতি থেকে যখন সে হিংসা করে।

(সূরা ফালাক : আয়াত-১-৫)

ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ

অর্থ : ঐ সব যাদুকারিণীর যারা সুতার গ্রন্থীতে ফুঁৎকার দেয় যখন তারা মন্ত্র পড়ে তাতে। (তাফসীরে কুরতুবী : ২০/২৫৭)

হাফেজ ইবনে কাসীর (র) বলেন : " وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ-এর তাফসীরে মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ ও জাহহাক বলেন : যাদুকারিণীদের। (তাফসীর ইবনে কাসীর : ৪/৫৭৩)

আল্লামা ইবনে জারীর আততাবারী বলেন : ঐ সমস্ত যাদুকারিণীর ক্ষতি থেকে যারা সুতার গ্রন্থীতে ফুঁৎকার দেয় তখন তারা তার ওপর মন্ত্র পড়ে।

(তাফসীর আল-কাসেমী : ১০/৩০২)

আল কুরআনের বহু আয়াতে যাদুর বর্ণনা এসেছে যা যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ।

হাদীস দ্বারা প্রমাণ

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুরাইক বংশের লাবীদ ইবনে আ'সাম নামে এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এক যাদু করে যার পরিণামে আল্লাহর রাসূলের কাছে মনে হয় যে, কোন কাজ করেছেন অথচ তিনি সেটি করেননি। অতঃপর একদিন অথবা এক রাতে তিনি আমার নিকট ছিলেন তিনি প্রার্থনার পর প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি জান যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সেই বিষয় সমস্যার সমাধান করেছেন যে বিষয়ে আমি সমাধান চেয়েছিলাম? আমার কাছে দুই ব্যক্তি আসলেন তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অপরজন পায়ের নিকট বসলেন। অতঃপর তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন :

লোকটির কিসের ব্যাথা ?

জবাবে দ্বিতীয়জন বললেন : লোকটিকে যাদু করা হয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি বললেন : কে যাদু করেছে?

দ্বিতীয়জন বললেন : লাবীদ ইবনে আসাম।

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন : কি দিয়ে যাদু করেছে?

দ্বিতীয়জন বললেন : চিরুণী, মাথা বা দাড়ির চুল ও পুরুষ খেজুর গাছের মোচার খোসা দ্বারা।

প্রথমজন বলেন : তা কোথায়?

দ্বিতীয়জন বলেন : জারওয়ান নামক কূপে।

নবী করীম ﷺ উক্ত কূপে সাহাবাদের কতিপয়কে নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বলেন : হে আয়শা! কূপের পানি যেন মেহদী মিশ্রিত এবং কূপের পার্শ্বের খেজুর গাছের মাথাগুলো যেন শয়তানদের মাথা। আয়েশা (রা.) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কেন আপনি তা বের করে ফেললেন না? তিনি বলেন : আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেছেন, তাই আমি অপছন্দ করি যে খারাপ বিষয়টি সকল মানুষের নিকট ছড়িয়ে দিব। পরিশেষে উক্ত যাদুকে ঢেকে ফেলার আদেশ হয়।

(বুখারী : ১০/২২২) ফাতহসহ ও মুসলিম : ১৪/১৭৪ নববীসহ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : ইয়াহুদী জাতি (আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ করুন) তাদের সর্বশেষ যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সামের সাথে একমত হয় যে, সে মুহাম্মদ ﷺ কে যাদু করবে আর তারা তাকে তিন দিনার প্রদান করবে।। ফলে এ বদবখত নবী ﷺ তাকে তিন দিন দিবে। যার ফলে এই বদবখত নবী ﷺ এর কতিপয় চুলের উপর যাদু করে। বলা হয়ে থাকে একজন ছোট মেয়ে যার নবী ﷺ-এর ঘরে যাতায়াত ছিল তার মাধ্যমে সে উক্ত চুল অর্জন করে এবং সে চুলগুলোতে তাঁর জন্য যাদু করত : গিরা দেয়ার এ যাদু রেখে দেয় জারওয়ান নামক কূপে।

হাদীসের সকল বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, এ যাদু স্বামী-স্ত্রী কেন্দ্রিক যাদু ছিল, যার ফলে নবী করীম ﷺ-এর এমন ধারণা হতো যে, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হবেন; কিন্তু যখন তার নিকটবর্তী হতেন তখন তা আর সম্ভব হতো না। এ যাদু তাঁর জ্ঞান, আচার-আচরণ বা তাঁর কার্যক্রমে কোন প্রভাব পরেনি; বরং যা উল্লেখ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল ছিল।

এ যাদু কতদিন ক্রিয়াশীল ছিল তা নিয়ে মতনৈক্য রয়েছে। কেঁউ বলেন ৪০ দিন কেউ ভিন্ন পোষণ করেন। (আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত)। এ থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ স্বীয় পালনকর্তার নিকট কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে থাকেন। যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করে দু'জন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়েছেন। একজন তাঁর শিয়রে বসেন, অন্যজন বসেন তাঁর পায়ের পার্শ্বে। অত:পর একজন অপরজনকে বলেন : তাঁর কি হয়েছে? অপরজন উত্তর দেন তিনি যাদুগ্রস্ত। প্রথমজন বলেন : কে যাদু করেছে?

দ্বিতীয়জন বলেন : লাবীদ ইবনে আ'সাম ইয়াহুদী। অত:পর তিনি (ফেরেশ্‌তা) বর্ণনা দিলেন যে, সে চিরুনী ও নবী ﷺ-এর কতিপয় চুলে যাদু করে, তা পুরুষ খেজুর বৃক্ষের মোচার খোলে রাখে, যেন তা কঠিনভাবে ক্রিয়াশীল হয়। অত:পর সে তা জারওয়ান নামক কূপে পাথরের নিচে পুঁতে দেয়। এরপর যখন উভয় ফেরেশ্‌তা দ্বারা নবী ﷺ-এর অবস্থার রহস্যের উদঘাটন হয়ে গেল নবী কারীম

ﷺ তখন তা বের করে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

হাদীস শরীফের বর্ণনার ভিত্তিতে ফুটে ওঠে যে, উক্ত ইয়াহুদী নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক আকারের যাদুর আশ্রয় নিয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল ﷺ-কে হত্যা করা। আর সর্বজনবিদিত যে, হত্যা করাও যাদু হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন। যার ফলে তাকে সর্বনিম্নস্তরের যাদুতে পরিণত করে দেন। আর এটিই হলো আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ।

একটি দ্বন্ধ ও তার সমাধান

মাযারী (রাহেমাতুল্লাহ) বলেন : (বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত উল্লেখিত যাদুর) এ হাদীসটি বিদ'আতীরা এ বলে অস্বীকার করে থাকে যে, ঘটনাটি নবুয়ত ও রিসালাতের মর্যাদার অপলাপ ও পরিপন্থী। নবুয়ত সন্দেহ সৃষ্টিকারী। এ জাতীয় ঘটনা সাব্যস্ত হওয়া শরীয়তের বিশ্বাসযোগ্যতার পরিপন্থী ইত্যাদি। মাযারী (রাহেমাতুল্লাহ) বলেন : তারা যা বলে তা তাদের নিছক ভ্রান্তির বহি:প্রকাশ। কেননা রিসালাতের দলীল প্রমাণ হলো মু'জিযা। যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার ও তাঁর নিষ্ক্রিয়তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আর দলীল প্রমাণবিহীন কোন কিছু দাবি বা সাব্যস্ত করা ভ্রান্ততা ছাড়া কিছু নয়।
(মুসলিম : ৪/২২১)

আবু জাকনী ইউসুকী (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর যাদুর কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া নবুয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। কেননা নবীদের রোগাক্রান্ত হওয়া পৃথিবীতে তাদের কোন অপূর্ণতা নয়; বরং আখিরাতে তাদের মর্যাদা বেড়েই চলতে থাকে। এমতাবস্থায় যাদুর রোগের কারণে তাঁর এমন ধারণা জন্ম হওয়া যে, তিনি পার্থিব বিষয়ে কিছু করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তা করেননি; এরপর তো আল্লাহ তা'আলা যাদুর বিষয় ও স্থান সম্পর্কে তাঁকে জানানোর এবং তা নিজে বের করে ফেলার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভুত হয়ে যায়। কাজেই এতে নবুওয়াতের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা আসতে পারে না, কেননা তা অন্যান্য রোগের মতোই এক রোগ ছিল।

উক্ত যাদু ক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞানে কোন প্রভাব পড়েনি; বরং তাঁর দেহের বাহ্যিকভাবেই ছিল। যেমন : দৃষ্টিতে কখনও ধারণা হতো, কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করার অথচ তা তিনি করেনি। আর এটা রোগাক্রান্ত অবস্থায় কোন দোষণীয় নয়।

তিনি আরো বলেন : আশ্চর্যজনক বিষয়, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যাদুর কারণে রোগ হওয়াকে রিসালাতের অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিতে দেখে অথচ ফিরআউনের যাদুকরদের ঘটনা স্পষ্ট বর্ণনায় আছে; তাতে রয়েছে মূসা (আ) তাদের যাদু ও লাঠির দৌড়া-দৌড়ি দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন ও নিজেকে তাদের সামনে তুচ্ছ মনে করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে দৃঢ় করেন। যেমন প্রতিই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى . وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْٓا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَّلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى . فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى.

অর্থাৎ, আমি বললাম : ভয় করো না, তুমিই প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা করেছে তা গিয়ে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না। অত:পর যাদুকরা সিজদায় বলল : আমরা হারূন ও মূসার (আ.) পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনলাম। (সূরা ত্বো-হা : আয়াত-৬৮৭০)

এর ফলে কোন বিজ্ঞ ও পণ্ডিত বলেননি যে, যাদুর লাঠির দৌড়া-দৌড়ির ফলে মূসার (আলাইহিস সালাম) ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া তার নবুয়াত ও রিসালাতের পরিপন্থী। বরং এসব বিষয়ে নবী ও রাসূলদের আরো ঈমান মজবুত ও বেড়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে থাকেন এবং দুশমনের কর্মকাণ্ডকে অকাট্য মু'জিযা দ্বারা নষ্ট করে দেন। যাদুকর কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং শেষ শুভ পরিণাম তাকওয়াবানদের জন্য সাব্যস্ত করেন। যেমনভাবে তা স্পষ্ট রয়েছে, তার স্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতগুলো।

(যাদুল মুসলিম : ৪/২২)

দ্বিতীয় হাদীস : আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা রাসূল করীম ﷺ বলেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী পোশাক থেকে বেঁচে থাক। সাহাবাগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? প্রকারে তিনি বলেন : ১. আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, ২. যাদু করা ৩. হক পন্থা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ও ৭. সতী-সাধবী, সরলা মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

(বুখারী : ৫/৩৯৩) ফাতহ সহ ও মুসলিম : ২/৮৩)

সাব্যস্তবিষয় : হাদীসখানা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী ﷺ আমাদেরকে যাদু থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেন এবং বর্ণনা করেন যে, এটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। এটি একটি উদ্ভট কিছু নয়।

তৃতীয় হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে জ্যোতিষী বিদ্যা শিক্ষা করল সে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা গ্রহণ করল, যে যত বেশি জ্যোতিষী বিদ্যায় অগ্রসর হলো সে যাদু বিদ্যায় যেন ততই অগ্রসর হলো। (আবু দাউদ : ৩৯০৫, ইবনে মাজাহ : ৩৭২৬)

সাব্যস্ত বিষয় : হাদীসখানা দ্বারা বুঝানো যায় যে, নবী করীম ﷺ বর্ণনা দেন যে জ্যোতিষী বিদ্যা একটি এমন বিদ্যা যা যাদু শিক্ষার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়। যার কারণে তিনি তা থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। তাই এটি প্রমাণ বহন করে যে, নিশ্চয় যাদু একটি বাস্তব বিদ্যা যা শিক্ষা করা হয়ে থাকে। যা কুরআনের আয়াতেও প্রমাণ পাওয়া যায়–

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ۔

"অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিশ্চয় অন্যান্য বিদ্যার মতই যাদু একটি বিদ্যা। যার মূলনীতি রয়েছে যার ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। আর আয়াত ও হাদীস এ যাদু শিক্ষারই বিরুদ্ধে হাজির হয়েছে।

চতুর্থ হাদীস : ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কুলক্ষণ নির্ণয় করল আর যার জন্য তা নির্ণয় করা হলো, যে গণকগিরি করল আর যার জন্য করা হলো এবং যে যাদু করল আর যার জন্য যাদু করা হলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে গণকের নিকট আসল অতঃপর সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে যা কিছু মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর নাযিল হয়েছে তার প্রতি কুফরী করল।"

সাব্যস্ত বিষয় : হাদীসখানা থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ যাদু থেকে ও যাদুকরের নিকট যাওয়া থেকে নিষেধ করেন। আর নবী করীম ﷺ এমন কোন জিনিস থেকে নিষেধ করেননি যার কোন অস্তিত্ব নেই বা ভিত্তি নেই।

পঞ্চম হাদীস : আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : "সর্বদা মদ পানকারী, যাদুতে বিশ্বাসী (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, যাদুই সরাসরি

প্রভাব ফেলে, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ভাগ্য ও তার ইচ্ছার কারণ নয়।) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।" এই হাদীসটি সহীহ যা ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, শায়খ আলবানী হাসান বলেছেন।

সাব্যস্ত বিষয় : যাদু নিজেই প্রভাব ফেলে থাকে এমন বিশ্বাস করা থেকে রাসূল ﷺ নিষেধ করেন। ঈমানদারদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যাদু বা অন্য কিছুতে কোন ক্ষতি করতে পারে না; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তা তাঁর লিখে রাখার কারণে হয়ে থাকে। যেমন–

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, আর তারা তার দ্বারা কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। (তবে যাদু বা অন্য কিছু আল্লাহর লিখনীর ফলে কারণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে।)

(সূরা বাকারা : আয়াত- ১০২)

ষষ্ঠ হাদীস : "যে ব্যক্তি জ্যোতিষী, যাদুকর বা গণকের নিকট আসল তারপর সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তবে অবশ্যই সে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি কুফুরী করল। (তারগীব- ৪৫৩)

যাদুর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে মনীষীদের উক্তি ও অভিমত

১. খাত্তাবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : প্রকৃতিবাসীদের একদল যাদুকে অস্বীকার করে ও তার বাস্তবতাকে খণ্ডন করে।

এর জবাব : নিশ্চয় যাদু প্রমাণিত ও তার বাস্তবতা রয়েছে। আরব-অনারব তথা পারস্য, ভারত উপমহাদেশীয় দেশসমূহ, রোমানও এরূপ বেশিরভাগ জাতিই একমত যে, যাদু প্রমাণিত। অথচ এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতির অন্তর্ভুক্ত।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

অর্থ : তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা যাদু থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ দিয়ে বলেন–

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ

অর্থ : গ্রন্থিতে ফুঁৎকার কারিণীদের অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই)।

তিনি আরোও বলেন : এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ থেকে আরো এমন অনেক সংবাদ এসেছে, যা কেউ অস্বীকার করে না একমাত্র যারা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তারা ছাড়া। আর ইসলামী ফিকাহবিদগণও যাদুকরের কি শাস্তি সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। আর যার ভিত্তি নেই তার এর চর্চা ও প্রসিদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কাজেই যাদুকে (অস্তিত্বকে) অস্বীকার করা একটি অজ্ঞতা ও যাদু অস্বীকার কারীদের প্রতিবাদ একটি অনর্থক বিষয়। (শারহুস সুন্নাহ : ১২/১৮৮)

২. ইমাম নববী বলেন : বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নিশ্চয় যাদুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। এটিই জমহুর উলামা ও সাধারণ উলামার মত। এ মতো প্রমাণিত হয় কুরআন ও প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা। (ফতহুল বারী হতে সংকলিত : ১০/২২২)

৩. ইমাম আবুল ইযয হানাফী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : যাদুর বাস্তবতা ও প্রকারের ক্ষেত্রে অনেকেরই মতভেদ রয়েছে; কিন্তু বেশিরভাগ বলেন : নিশ্চয়ই যাদুগ্রস্তের মৃত্যু ও তার রোগাক্রাণ্ডের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোন কিছুর প্রকাশ্য ক্রিয়া ছাড়াই....। (শরহুল আকীদা আত্‌তাহবিয়া : ৫০৫)

৪. আল্লামা ইবনে কুদামা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : যাদুর প্রভাবে মানুষ দৈহিক ও মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা ঘটে। কুরআন কারীমের ঘোষণা−

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ .

অর্থ : তারা তাদের নিকট থেকে এমন যাদু শিক্ষা নিত যার দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত। (ফতহুল মজিদ থেকে সংকলিত : ৩১৪)

অতএব যাদু প্রসঙ্গে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে এবং রাসূল ﷺ যাদুকরের নিকট গমন করতে নিষেধ করেছেন। আর নবী ﷺ এমন কোন বস্তু থেকে নিষেধ করতে পারেন না যার অস্তিত্ব নেই। কাজেই এতে বুঝা যায় যে যাদুর অস্তিত্ব আছে।

৩. যাদুর শ্রেণীভেদ

ইমাম রাযী (র) যাদুকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন

১. **তারকা পূজারীদের যাদু :** এর সাতটি ঘূর্ণায়মান তারকার পূজা করত এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ তারকাসমূহ বিশ্বকে পরিচালনকারী এবং এগুলোর নির্দেশেই মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ হয়ে থাকে। আর এগুলোর কাছে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আইহিস সালাম)-কে পাঠিয়েছেন।

২. **ধারণাপ্রবণ ও কঠিন আত্মা ওয়ালাদের যাদু :** কল্পনা ও ধারণা দ্বারা মানুষ খুবই প্রভাবিত; কেননা মানুষের স্থলে রশি অথবা বাঁশের উপর যত সহজে চলা সম্ভব তা গভীর সমুদ্রে অথবা বিপদজনক কিছুর উপরে বা ঝুলন্ত বাঁশের উপর চলা অসম্ভব। তিনি আরো বলেন : যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে, নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া রোগীর কোন লাল জিনিস দেখা উচিত নয়। এটি শুধু এজন্য যে মানুষের প্রকৃতিই হলো সীমাহীন ধারণাপ্রবণ।

৩. **জ্বীনের সহায়তার যাদু :** জ্বীন দু'প্রকার : ১. মুমিন ও ২. কাফির। কাফের জ্বীনদেরকেই শয়তান বলা হয়। ইমাম রাযী বলেন : যাদুকররা শয়তানের মাধ্যমে যাদুক্রিয়া পৌছিয়ে থাকে।

৪. **ভেল্কিবাজী ও নজর বন্দী :** এটি এমন কলাকৌশল যার ফলে মানুষের দৃষ্টি ও মনযোগ সবদিক থেকে আকর্ষণ করে কোন নির্ধারিত ক্ষেত্রে গণ্ডিভূত করে তাকে আহমক বানিয়ে দেয়।

৫. **চমকপ্রদ কর্ম প্রদর্শনমূলক :** এটি কোন যন্ত্র সেট করে দেখানো হয়। যেমন : কোন অশ্বারোহীর নিকট একটি শিঙ্গা রয়েছে বা মাঝে মাঝে এমনি এমনি বেজে ওঠে বা যেমন এ্যালারম ঘড়ি নির্দিষ্ট সময়ে বেজে ওঠে। এমনটি কেউ অন্যভাবে সাজিয়ে যাদু প্রকাশ করে। তিনি বলেন : এটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিষয়, যাদু নয়, যে এর বিদ্যা হাসিল করবে সে তা করতে সক্ষম।

৬. **কোন বিশেষ দ্রব্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে :** যেমন খাবারে বা তৈলে মিশিয়ে। তিনি বলেন : জেনে রাখুন, বিশেষ দ্রব্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন : ম্যাগনেট।

৭. **যাদুকর মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে জয় করে যাদু করে থাকে :** যেমন সে দাবী করল যে, সে ইসমে আজম জানে এবং জ্বীন তার অনুগত তার এ সব কথার দ্বারা যখন কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা হয় এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে না পারে। তার ওপর আস্থা রেখে তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলে সে মুহূর্তে যাদুকরের দ্বারা সম্ভব যা চায় তাই করতে পারে।

* একজনের কথা অন্যজনের নিকটে গোপন, সূক্ষ্ম ও আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে লাগান যা মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচারিত। (তাফসীর ইবনে কাসীর : ১/১৪৮)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম রাযী উল্লেখিত অনেক প্রকারই যাদু বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা সবগুলোর মধ্যেই সূক্ষ্মতা পাওয়া যায়। আর যাদুর আভিধানিক অর্থ হলো যার কারণ অতি সূক্ষ ও গোপনীয়।"

(ইবনে কাসীর : ১/১৪৭)

ইমাম রাগেব (র)-এর নিকট যাদুর শ্রেণীভেদ

ইমাম রাগেব (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : যাদুর ব্যবহার বিভিন্ন অর্থে হয়ে থাকে

১. প্রত্যেক ঐ জিনিস যা অতি সূক্ষ্ম ও গোপনীয় হয়ে থাকে। তাইতো বলা হয় سَحَرْتُ الصَّبِيَّ অর্থ : আমি বাচ্চাটিকে প্রতারিত করেছি ও আকৃষ্ট করেছি। অতএব যে কোন কিছুকে আকৃষ্ট করতে পারে সেই তাকে যেন যাদু বলে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো কবিদের কবিতা, অন্তর কেড়ে নেয়ার জন্য।

অনুরূপ কুরআনের বাণী–

بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

অর্থ : আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (সূরা হিজর : আয়াত-১৫)

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো হাদীসে বর্ণিত। إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا অর্থ: নিশ্চয় কিছু কথা রয়েছে যাদুময়ী।

২. যা প্রতারণার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যার কোন বাস্তবতা নেই, যেমন : ভেল্কিবাজদের কাজ-কর্ম, হাতের প্যাঁচের সূক্ষ্মতার মাধ্যমে মানুষকে নজর বন্দী করে ফেলে।

৩. শয়তানের সাহায্যে তার নৈকট্য গ্রহণ করে : যা কিছু হাসিল হয় এর প্রতিই কুরআন কারীমের বাণীর ইঙ্গিত–

وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

অর্থ : কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা মানুষদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত। (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

৪. তারকা পূজার মাধ্যমে জ্যোতিষীদের যাদু। (ফাতহুল বারী থেকে গৃহীত : ১০/২২২ ও রাগেব ইস্পাহানীর আল-মুফরাদাত দ্রষ্টব্য)

যাদুর শ্রেণীভেদ কেন্দ্রিক একটি প্রতিপাদ

ইমাম রাযী, রাগেব ও অন্যান্য মনীষীদের যাদুবিদ্যার শ্রেণীভেদ প্রসঙ্গে গবেষণা ও প্রতিপাদনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা যাদুর মধ্যে এমন কিছুও শামিল করেছেন যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কারণ হলো তাঁরা তা যাদুর আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে করেছেন। (অর্থাৎ যার কারণ সূক্ষ্ম ও গোপনীয়। এ থেকে তারা আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বা কিছু হাতের মার-প্যাচ করা হয়ে থাকে বা মানুষের মাঝে পরস্পরের গোপনে যা লাগিয়ে থাকে– এ জাতীয় অনেক কিছুকে যাদুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যার কারণ সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট ও গোপনীয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; বরং আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য কেন্দ্রিভূত হবে বাস্তব যাদুর মধ্যে যে, যাদুর ক্ষেত্রে যাদুকর সাধারণত ভরসা ও নির্ভর করে থাকে জ্বীন, শয়তানের ওপর। আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হলো, যা ইমাম রাযী ও রাগেব বর্ণনা করেছেন যার নাম দেয়া হয় তারকার আধ্যাত্মিকতা বা কীর্তি, কিন্তু এক্ষেত্রেও বাস্তব কথা হলো, তারকা আল্লাহর এক সৃষ্টি, তাঁর বিধানের অধীন অতএব তারকার কোন সৃষ্টির উপর আধ্যাত্মিকতা বা নিজস্ব কোন প্রভাব নেই।

কেউ যদি বলে : আমরা তো দেখি যে, কিছু সংখ্যক যাদুকর যারা তাদের ধারণা মতে তারকার জন্য কিছু নাম উচ্চারণ করে তন্ত্রমন্ত্র পড়ে বা তার দিকে ইশারা-ইঙ্গিত করে ও সম্বোধন করে। যার ফলে দর্শকের সামনে যাদুক্রিয়াও বাস্তবরূপ নেয়?

তার জবাব : যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে এটি মূলত তারকার প্রভাবে নয়; বরং তা শয়তানের প্রভাবে যাদুকরকে গোমরাহ করা ও ফিতনায় ফেলানোর জন্যই হয়ে থাকে। যেমন বর্ণিত আছে যে, যখন তারা পাথরের মূর্তিকে সম্বোধন করত, তখন শয়তান সে মূর্তির ভেতর থেকে উচ্চ আওয়াজে জবাব দিত। আর তারা মনে করে যে, তা তাদের মা'বুদ কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তাই মানুষকে গোমরাহ করার বহুপন্থা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মানুষ ও জ্বীন শয়তানের ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

৪. যাদুকরের জ্বীন উপস্থিত করার পদ্ধতি

যাদুকর ও শয়তানের মধ্যে চুক্তি

যাদুকর এবং শয়তান সাধারণত এ কথার উপর একমত প্রকাশ করে যে, যাদুকর কতক শিরকভূক্ত কাজ করবে অথবা প্রকাশ্য কুফুরি কাজ করবে। এর পরিবর্তে শয়তান যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত হবে বা অন্য কাউকে তার অধীন করে দিবে যে তার সেবা করবে। আর চুক্তিটি হয়ে থাকে সাধারণত যাদুকর এবং জ্বীন শয়তানের গোত্র প্রধানের সাথে। কাজেই শয়তানদের নেতা সবচেয়ে বোকা জ্বীনকে যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত করে থাকে। আর সেই জ্বীন অথবা শয়তান গোপনীয় তথ্য যাদুকরকে দেয়, দুজনের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি বা উভয়ের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করিয়ে দিয়ে থাকে বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। অনুরূপ আরো অনেক কিছু সম্পাদন করিয়ে থাকে যা বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ ষষ্ঠ অধ্যায়। এভাবে যাদুকর জ্বীন ও শয়তানকে তার অধীনে নিয়ে মন্দ কাজ করে থাকে।

অত:পর যদি জ্বীন কখনও আনুগত্য না করে তবে যাদুকর তাবিজের মাধ্যমে সে নেতা জ্বীনের নৈকট্য হাসিল করে এবং তার গুণ কীর্তন ও তার নিকট ফরিয়াদ করে তার (গোত্রের প্রধান জ্বীনের) নিকট অভিযোগ পেশ করে এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করে তার কাছেই সাহায্য চায়। অত:পর সেই জ্বীন সরদার সে সাধারণ জ্বীনকে শাস্তি দেয় এবং যাদুকরের আনুগত্যে বাধ্য করে।

এভাবে যাদুকর আর তার অনুগত জ্বীনের মাঝে বৈরী সম্পর্ক এবং শত্রুতাও সৃষ্টি হয়, আর এ জ্বীন যাদুকরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি তার সন্তান ও ধন-সম্পদে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং যাদুকরকেও অনেক কষ্ট দিয়ে থাকে। যেমন : স্থায়ীভাবে মাথা ব্যথা, ঘুম না আসা, রাতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি। আর যাদুকরের সাধারণত সন্তানও ভূমিষ্ট হয় না। কেননা জ্বীন মাতৃগর্ভে শিশুকে মেরে ফেলে। আর এ বিষয় যাদুকরদের নিকট প্রসিদ্ধ। এমনকি যাদুকর সন্তানের আশায় যাদু করা থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে আমার একটি স্মরণীয় কাহিনী উল্লেখ করছি–

আমি এক যাদুতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করছিলাম। যখন আমি তার ওপর কুরআন কারীম পড়ছিলাম তখন যাদুর আদেশপ্রাপ্ত জ্বীন সেই নারী রোগীর মুখের দ্বারা বলতে লাগল আমি এ নারীর ভিতর থেকে বের হব না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন? তখন সে বলল, যাদুকর আমাকে মেরে ফেলবে। আমি বললাম,

তুই এমন স্থানে চলে যা যেখানে যাদুকর পৌঁছতে পারবে না। জবাবে জ্বীনটি বলল : যাদুকর আমাকে খোঁজার জন্যে অন্য জ্বীন প্রেরণ করবে। তখন আমি বললাম তুই সত্য ও নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে ইসলাম কবূল করলে ইনশাআল্লাহ আমি তোমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শিখিয়ে দিব যা তোমাকে কাফের জ্বীনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। তখন সে বলল : "আমি মুসলমান কখনও হব না; বরং আমি সব সময় খ্রিস্টান থাকব। আমি বললাম : ধর্মগ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা করা নেই; কিন্তু তুই এখন এ নারী থেকে বের হয়ে যা। সে বলল, কখনও না। আমি বললাম এখন আমি তোর ওপর কুরআন পাঠ করব যে পর্যন্ত তুই চলে না যাবি। এরপর আমি ওকে অনেক প্রহার করলাম। যার ফলে সে কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, যাচ্ছি এক্ষুনি যাচ্ছি।

অবশেষে আল-হামদুলিল্লাহ সেই জ্বীন, নারী থেকে বের হয়ে চলে গেল। আল্লাহ সব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান এটা সত্য যে, যাদুকর যত বেশি কুফুরী করবে জ্বীন তার আনুগত্য ততবেশি করবে। আর তা না হলে আনুগত্য করে না।

যেভাবে যাদুকর জ্বীন উপস্থিত করে

জ্বীন উপস্থিত করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। আর প্রত্যেক পদ্ধতিতেই স্পষ্ট শিরক বা কুফরী জড়িত রয়েছে। সেগুলোর কতিপয় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে আটটি পদ্ধতি ও প্রত্যেক পদ্ধতিতে শিরকের কি ধরন কিছু সংক্ষিপ্তকারে বিবরণ প্রকাশ করা হবে। পরিপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ যা কেউ তা শিখে ব্যবহার না করতে পারে। যার কারণে তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলুপ্ত করে উল্লেখ করা হবে। আর এগুলো এজন্যেই বর্ণনা হলো, কেননা কোন কোন মুসলমান কুরআনী চিকিৎসা ও যাদুর সাহায্যে চিকিৎসার তফাত করতে পারে না। অথচ প্রথমটি হলো ঈমানী চিকিৎসা আর দ্বিতীয়টি হলো শয়তানী চিকিৎসা।

আর বিষয়টি আরো কঠিন হয়ে যায় যখন চতুর যাদুকর স্বীয় কুফরী যাদু মন্ত্রকে চুপিসারে পাঠ করে; আর যখন এর মাঝে কোন আয়াত হয় তখন তা রুগীকে স্বজোরে পড়ে শুনায় যাতে সে ধারণা করে তাকে কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্ছে; কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি তা নয়। এজন্যে রুগী যাদুকরের প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করে মানা শুরু করে। কাজেই এখানে এই পন্থাগুলো বর্ণনার এটিই উদ্দেশ্য যাতে মুসলমানগণ গোমরাহ থেকে রক্ষা পায় এবং উক্ত ভণ্ড অপরাধীদেরকে চিনতে পারে।

যাদুকরের জ্বীন উপস্থিত করার পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি : শপথ করা

একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে যাদুকর যাদু আগুন জ্বালায়। আগুনে তার উদ্দেশ্য মতো এক জাতীয় ধূপ দেয়। সে যদি পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি বা শত্রুতা-হিংসা বা এমন কিছু ইচ্ছা পোষণ করে তবে আগুনে সে দুর্গন্ধযুক্ত ধূপ নিক্ষেপ করে। আর যদি পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে আকৃষ্ট করা বা অন্য যাদু নষ্ট করার ইচ্ছা হয় তবে সে আগুনে সুগন্ধযুক্ত ধূপ মিশায়। তারপর যাদুকর নির্ধারিত শিরকী মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। যাতে সে জ্বীনদের নেতাদের দোহাই বা শপথ দেয়, তার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে চায়; এমন কি তার মন্ত্রে আরো নানা ধরনের শিরক অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন : বড় জ্বীনের সম্মান ও বড়ত্বের বর্ণনা, তার নিকট আবেদন ও সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি।

শর্ত হলো এমতাবস্থায় যাদুকরকে নাপাক থাকতে হবে এবং না নাপাক পোশাক পরে থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার কুফরী মন্ত্র পড়া শেষ হওয়া মাত্রই কুকুর বা অজগর বা অন্য কোন আকৃতিতে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব ঘটে। অত:পর যাদুকর যা তার ইচ্ছা তাকে নির্দেশ করে। আবার কখনও তার সামনে কোন কিছুই প্রকাশ পায় না। তবে সে তার একটি আওয়াজ শ্রবণ করে। আবার কখনও কোন কিছুই শুনে না, তবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন চিহ্নতে যাদুর গিরা লাগায়। যেমন : তার চুলে বা তার পোশাকের টুকরাই যাতে তার দেহের গন্ধ থাকে ইত্যাদি। এরপর সে যা ইচ্ছা সে অনুযায়ী জ্বীনকে আদেশ করে।

উক্ত পদ্ধতি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফুটে ওঠে

১. জ্বীন অন্ধকার কক্ষ ভালোবাসে।

২. জ্বীন ধূপের গন্ধ গ্রহণ করে, যাতে আল্লাহর নাম না নেয়া হয়।

৩. এ পদ্ধতিতে স্পষ্ট শিরক হলো, জ্বীনের দোহাই বা শপথ ও তাদের নিকট আবেদন ও সাহায্য প্রার্থনা করা।

৪. জ্বীন নাপাকী ভালোবাসে এবং শয়তান নাপাকের নিকটতম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : যবাই করা

যাদুকর একটি পাখি বা জন্তু বা মুরগি বা কবুতর বা অন্য কিছু জ্বীনের আবদার অনুযায়ী উপস্থিত করে। সাধারণত যা কালো রঙের হয়ে থাকে। কেননা জ্বীন কালো রং ভালোবাসে। তারপর আল্লাহ্ নাম না নিয়ে তা যবাই করে। অতঃপর কখনও সে রক্ত রুগীকে মাখায়। কখনও এরূপ না করে পরিত্যক্ত ঘরে বা কূপে বা মরুভূমিতে ফেলে দেয়। যেগুলোতে সাধারণত জ্বীন বসবাস করে থাকে। নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম নেয় না। এরপর নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তের করে শিরকী মন্ত্র পড়ে। তারপর জ্বীনকে যা ইচ্ছা আদেশ করে।

উক্ত পদ্ধতির ব্যাখ্যা : এ পদ্ধতিতে দু'ভাবে শিরক হয়ে থাকে।

প্রথমত : জ্বীনের উদ্দেশ্যে যবাই করা। যা পূর্ব ও পরবর্তী সকল ইমামের ঐক্যমতে হারাম; বরং তা হলো শিরক। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে যবাই করা কোন মুসলমানের জন্য খাওয়া হারাম। আর যবাই করা তো বহুদূরের বিষয় তা সত্ত্বেও কোন কোন অজ্ঞতা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে এ জাতীয় কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া বলেন : ওযাহাব আমাকে বলেন : কোন এক খলিফা একটি ঝর্ণা খনন করে। যখন সে তা প্রবাহিত করাতে চায়। সে জ্বীনের জন্য সেখানে যবাই করে, যাতে তারা তার পানি ভূ-গর্ভে না নামিয়ে দেয়। অত:পর তা জনগণকে খাওয়ায়। এ সংবাদ ইবনে শিহাব আয যুহরীকে পৌছালে তিনি বলেন : সে তা যবাই করেছে তার উদ্দেশ্যে, যার উদ্দেশ্যে যবাই করা হারাম; আবার তা জনগণকে আহার করিয়েছে যা তাদের জন্য হারাম; বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন ঐ জিনিস ভক্ষণ করতে যা জ্বীনের উদ্দেশ্যে যবাই করা ইত্যাদি। (আহকামুল মারজান : ৭৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত-আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) তার বর্ণনায় বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাই করল আল্লাহ্ তার প্রতি অভিশাপ করুন।"

দ্বিতীয়ত : শিরকী মন্ত্র : আর তা হলো, ঐ সমস্ত শিরকী কালাম যা জ্বীন উপস্থিত করার সময় সে পেশ করে থাকে, যা স্পষ্ট শিরক। যেমন : শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রাহেমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের অনেক স্থানের উল্লেখ করেন। (আল ইবানা ফী উমুমির রিসালা)

তৃতীয় পদ্ধতি : নিকৃষ্টতম পদ্ধতি

এটি অতি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। এতে শয়তানের এক বড় দল অংশ নেয় ও যাদুকরের সেবা করে এবং তার আদেশ বাস্তবায়ন করে। কেননা যাদুকর এতে সর্ববৃহৎ কুফরী ও কঠিনভাবে নাস্তিকের পরিচয় দেয়।

এ পদ্ধতির ব্যাখ্যা : যাদুকর (আল্লাহর অভিশাপ হোক) জুতা পায়ে কুরআন কারীম পদদলিত করে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করে। অত:পর পায়খানায় কুফরী কালাম পড়ে একটি কক্ষে প্রত্যাবর্তন করে এবং জ্বীনকে যা ইচ্ছা আদেশ করে। জ্বীন দ্রুত তখন তার অনুসরণ করে ও আদেশ পালন করে থাকে। আর জ্বীন তা করে থাকে শুধুমাত্র যাদুকরের মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করার জন্য। এভাবে সে শয়তানের ভাইয়ে পরিণত হয় এবং স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। যার ফলে তার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষিত হয়।

এ পদ্ধতি যাদুকরের সাথে বেশ কিছু কবীরা গুনায় লিপ্ত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়। যেমন: যা কিছু উল্লেখ হয়েছে তা ছাড়াও হারাম কাজগুলোতে পতিত হওয়া, সহকামিতা, ব্যভিচার, ধর্মকে গালি দেয়া ইত্যাদি। এসবগুলো করে থাকে শয়তানের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে।

চতুর্থ পদ্ধতি : অপবিত্রতার পদ্ধতি

মালাউন যাদুকর এ পদ্ধতিতে কুরআনের সূরা ঋতুস্রাবের (হায়েজের) রক্ত দ্বারা বা অন্য কোন অপবিত্র কিছু দ্বারা লিখে; তারপর শিরকী মন্ত্র পড়ে, যার ফলে জ্বীন উপস্থিত হয়। এরপর তার যা ইচ্ছা তাকে আদেশ করে। এ পদ্ধতি যে স্পষ্ট কুফরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোন সূরা এবং কোন আয়াতকে উপহাস করা আল্লাহর সাথে কুফরী। আর যেখানে তা অপবিত্র জিনিস দ্বারা লিখা হয়, আল্লাহর নিকট আমরা এ অবমাননা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের অন্তরে ঈমানকে শক্তিশালী করেন ও ইসলামের ওপর মৃত্যুদান করেন ও নবী ﷺ-এর সাথে হাশর করেন। (আমিন)

পঞ্চম পদ্ধতি : উল্টাকরণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে মালাউন যাদুকর কুরআনের সূরাকে উল্টা অক্ষরে লিখে থাকে। অর্থাৎ শেষ হতে প্রথম, অত:পর শিরকী কালাম বা মন্ত্র পড়ে, যার ফলে জ্বীন উপস্থিত হয় ও তাকে তার আদেশ দেয়।

এ পদ্ধতিতেও শিরক ও কুফর থাকার কারণে হারাম।

ষষ্ঠ পদ্ধতি : জ্যোতিষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও বলা হয়। কেননা যাদুকর নির্ধারিত এক তারকা উদয়ের উপেক্ষায় থাকে। অত:পর সে তাকে ডেকে যাদু মন্ত্র পড়তে থাকে। তারপর অন্যান্য শিরকী ও কুফরী কালাম পাঠ করতে থাকে। যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তারপর সে এমনভাবে নড়া-চড়া করে যাতে সে ধারণা পোষণ করায় যে, সে উক্ত তারকার আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তা করছে; কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহ্ ছাড়া তারকার ইবাদত করছে। যদিও এ জ্যোতিষী বুঝতে পারে না যে, তার এ কর্ম আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত ও অন্যের মহত্ব প্রকাশ হয়। এরপর শয়তানরা তার নির্দেশে সাড়া দেয়; আর সে ধারণা করে যে, এ তারকায় তাকে এসবে সাহায্য করে। অথচ উক্ত তারকার এ বিষয়ে কিছুই অবগতি নেই।

যাদুকররা ধারণা করে থাকে যে, এ যাদু আর খুলবে না যে পর্যন্ত দ্বিতীয়বার প্রকাশ না পাবে। (এ বিশ্বাস একান্তই যাদুকরদের; কিন্তু কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা এ যাদু আল্লাহর ফজলে নষ্ট করা যায়।) আর সত্যই কোন কোন তারকা বছরে মাত্র একবারই প্রকাশ পায়। কাজেই যাদুকররা তার প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে ও পরে সে তারকার নিকট আবেদন ও সাহায্য কামনা করে মন্ত্র পড়তে থাকে যাতে তাদের যাদু খুলে দেয়।

নি:সন্দেহে এ পদ্ধতিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও তার বড়ত্বের প্রকাশের জন্য শিরক ও কুফুরী।

সপ্তম পদ্ধতি : পাঞ্জা পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে যাদুকর ছোট এমন একটি বালককে উপস্থিত করে যে, এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি। আর সে যেন বিনা ওযূ হয় তারপর সে বালকের বাম পাঞ্জা ধরে তার হাতে এরূপ চতুর্ভুজ আঁকে।

অত:পর এই চতুর্ভুজের পার্শ্বে শিরকী যাদুমন্ত্র লিখে। আর এ যাদুমন্ত্র সে তার চার কোণায় লিখে থাকে। অত:পর বালকের হাতের তালুতে চতুর্ভুজের মধ্যখানে কিছু তৈল, একটি নীল ফুল বা কিছু তৈল ও নীল কালি রাখে। এরপর আবার অন্য এক মন্ত্র লিখে একক অক্ষর দ্বারা এক লম্বা কাগজে, তারপর সে কাগজ ছেলেটির চেহারার উপর ছাহার আকৃতিতে রাখে। তাঁর উপর পরিয়ে দেয় একটি টুপী যাতে তা ঠিক থাকে। তারপর বালকটিকে মোটা কাপড় দ্বারা পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। এমতাবস্থায় বালকটি তার তালুর দিকে তাকাতে থাকে; কিন্তু ভিতরে অন্ধকার হওয়ার কারণে কিছু দেখতে পায় না। এরপর মালাউন যাদুকর

কঠিন প্রকৃতির কুফরী পড়তে থাকে। তারপর বালকটি হঠাৎ করে আলো দেখতে পায় ও দেখে যে তার হাতের তালুতে একটি ছবি নড়া-চড়া করছে। অত:পর যাদুকর বালককে প্রশ্ন করে কি দেখছ? বালক জবাব দেয় আমি আমার সামনে এক ব্যক্তির ছবি দেখছি।

যাদুকর বলে : তাকে বল : তোমাকে যাদুকর বা পীর সাহেব এ এ বিষয়ে বলছে। এরপর ছবিটি আদেশ অনুযায়ী নড়া-চড়া করতে থাকে। এ পদ্ধতি তারা সাধারণত হারানো বস্তু খোঁজায় ব্যবহার করে থাকে। নি:সন্দেহে এ পদ্ধতিও শিরক, কুফর ও অবোধগম্য তন্ত্র-মন্ত্রে ভরা।

অষ্টম পদ্ধতি : চিহ্ন গ্রহণ পদ্ধতি

যাদুকর এ পদ্ধতিতে রুগীর নিকট থেকে তাঁর কোন চিহ্ন খোঁজ করে। যেমন : রুমাল, পাগড়ী, জামা বা এমন কোন ব্যবহৃত জিনিস যাতে রুগীর দেহের গন্ধ পাওয়া যায়। তারপর সে রুমালের এক পার্শ্ব গিরা দেয়। এরপর চার আঙ্গুল পরিমাণ পর খুব শক্ত করে রুমালটি ধারণ করে সূরা কাউসার বা অন্য যে কোন ছোট একটি সূরা উচ্চ আওয়াজে পড়ে চুপি চুপি শিরকী মন্ত্র পড়ে। তারপর জীনকে আহ্বান করতে থাকে ও বলতে থাকে : যদি তার রোগ জীনের কারণে হয়ে থাকে তবে সে রুমাল (বা কাপড়)টি ছোট করে দাও। যদি তার রোগ বদনজরের কারণে হয় তবে তা লম্বা করে দাও। আর যদি সাধারণ ডাক্তারী কোন রোগ হয় তবে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর সেটি পুনরায় মেপে যদি তা চার আঙ্গুলের চেয়ে বড় পায় বলে : তুমি হিংসুকের বদনজরে আক্রান্ত হয়েছ। যদি তা ছোট পায় তবে বলে যে, তুমি জ্বীনের আসরে পড়েছ। আর যদি অনুরূপ পায় আঙ্গুলই থাকে তবে বলে : তোমার নিকট কিছু নেই। তুমি ডাক্তারের নিকট যাও।

এ পদ্ধতির ব্যাখ্যা

১. রুগীর মধ্যে সংশয়ে সৃষ্টি করে দেয়া, উচ্চ আওয়াজে কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে যে সে কুরআনের দ্বারা তার চিকিৎসা করছে অথচ সে তখনই চুপে চুপে মন্ত্র পড়ে থাকে।

২. জ্বীনের নিকট আবেদন ও সাহায্য কামনা এবং তাদেরকে ডাকা ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা। অথচ এগুলো শিরক।

৩. জ্বীনদের মাঝে অনেক মিথ্যা পাওয়া যায়। অতএব আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, এ বিষয়ে এ জ্বীনের কথা সত্য না মিথ্যা। আমরা কোন কোন যাদুকরের

কথা ও কাজকে কখনও কখনও পরীক্ষা করেছি, তাতে দেখা গেছে, সে কখনও সত্য বলেছে; কিন্তু বেশিরভাগই মিথ্যা। এমনও হয়েছে যে, আমাদের নিকট কোন রুগী এসে বলেছে, তাকে যাদুকর বলেছে : তোমার বদ নজর লেগেছে। অথচ যখন তার ওপর কুরআন করীম তেলাওয়াত করা হয়েছে তখন জ্বীন কথা বলে উঠেছে। তা আসলে বদনজর নয়। এমন অনেক প্রকারের পদ্ধতি আরো রয়েছে যা আমরা অবগত।

যাদুকর চেনার উপায় ও আলামত

কোন চিকিৎসক বা কবিরাজের মধ্যে এ সব লক্ষণ বা আলামতের কোন একটিও পাওয়া গেলে নি:সন্দেহে বুঝা যাবে যে, সে যাদুকর। আলামতগুলো হলো–

১. রুগীর নাম ও মাতার নাম জিজ্ঞেস করা।

২. রোগীর কোন চিহ্ন গ্রহণ করা। যেমন : পোশাক, টুপী, রুমাল ইত্যাদি।

৩. অস্পষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র ও মায়াজাল পড়া।

৪. রোগীকে চতুর্ভুজ নক্সা বানিয়ে নেয়া, যাতে থাকে অক্ষর বা নম্বর।

৫. রোগীকে এক নির্ধারিত সময় এক কক্ষে (যাতে আলো প্রবেশ করে না।) লোকদের অন্তরালে থাকার নির্দেশ দেয়া।

৬. যবাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জীবন-জন্তু চাওয়া এবং তা আল্লাহর নামে যবাই না করা। কখনও তার রক্ত ব্যথার স্থানে মাখান বা বিরাণ ঘর বা স্থানে তা নিক্ষেপ করা।

৭. রহস্যময় মায়াজাল বা মন্ত্র লিখা।

৮. রোগীকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যা সাধারণত ৪০ দিন হয়ে থাকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা। এ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে যে, যাদুকর যে জ্বীন ব্যবহার করে সে খ্রিস্টান।

৯. রোগীকে কোন জিনিস পুঁতে রাখতে দেয়া।

১২. রোগীর নিজেই নাম, ঠিকানা ও সেই সমস্যা বলা।

১১. রোগীকে কিছু পাতা দিয়ে তা জ্বালিয়ে তা থেকে ধোয়া গ্রহণ করতে বলা।

১২. অস্পষ্ট কালাম বা কথা দ্বারা তাবীজ বানিয়ে দেয়া।

১৩. ছিন্ন-ছিন্ন অক্ষর লিখে রোগীকে নক্সা বা তারিখ বানিয়ে দেয়া বা কোন সাদা পাথরে লিখে দেয়া ও তা ধৌত করে পানি পান করতে বলা।

আপনি যদি এসব লক্ষণ জেনে বুঝতে পারেন যে, সে যাদুকর তবে আপনি অবশ্যই তার নিকট গমন করা থেকে সতর্ক হয়ে যাবেন নচেৎ আপনার প্রতি রাসূল ﷺ এর বাণী প্রযোজ্য হয়ে যাবে।

مَنْ اَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَبِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গণকের নিকট আগমন করে সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল। (হাসান সনদে বাজ্জার বর্ণনা করেন এবং আহমদ ও হাকেম বর্ণনা করেন, আলবানী সহীহ্ বলেছেন।)

৫. ইসলামে যাদুর বিধান

ইসলামী শরীয়তে যাদুকরের বিধান

১. ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি যাদু করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার এ বাণী প্রযোজ্য−

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

অর্থ : নিশ্চয় তারা জানে যে, যা তারা কিনেছে পরকালে এর জন্য কোন অংশ নেই। (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

অত:পর বলেন : আমার মতামত হলো, যাদুকরকে হত্যা করা যদি সে যাদু কর্ম করে থাকে।

২. ইবনে কুদামা (রা.) বলেন : যাদুকরের শাস্তি হত্যা। আর এ মতামত ব্যক্ত করেছেন, উমর, উসমান ইবনে আফফান, ইবনে উমর, হাফসা, জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ, জুনদুব ইবনে কাব, কায়েস আব্দুল্লাহ সাদ, আমর ইবনে আব্দুল আযীয, আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ)

৩. ইমাম কুরতুবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিম মণিষীদের মধ্যে মুসলিম যাদুকর ও (বিধর্মী) যিম্মী যাদুকরের শাস্তির বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, যখন মুসলমান যাদুকর কুফুরি কালামের মাধ্যমে যাদু করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর তার

তাওবাও গ্রহণীয় হবে না। আর না তাকে তাওবা করতে বলা হবে। কেননা এটা এমন বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা যাদুকে কুফুরি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

অর্থ : তারা যাকেই যাদু বিদ্যা শিখাতো তাকে বলে দিত যে তোমরা যাদু শিখে কুফুরি করো না, নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

আর এ মতামত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু সাওর, ইসহাক এবং আবু হানীফা (র)।

৪. ইমাম ইবনে মুনযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যখন কোন ব্যক্তি স্বীকার করে যে, সে কুফুরি কালাম দিয়ে যাদু করেছে, তখন তাকে মেরে ফেলা ওয়াজিব। যদি সে তাওবা না করে থাকে। অনুরূপভাবে আরো কুফরীর যদি প্রমাণ ও বিবরণ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তবুও তাকে মেরে ফেলা ওয়াজিব। আর যদি তার কথা কুফুরি না হয় তবে তাকে মেরে ফেলা জায়েয হবে না। আর যদি যাদুকর তার যাদু দ্বারা কাউকে মেরে ফেলে তবে তাকেও মেরে ফেলা হবে আর যদি ভুলক্রমে মেরে ফেলে তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে।

৫. হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ) বলেন : "মনীষীগণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নেলিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যাতে যাদুকর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا

অর্থাৎ যদি তারা ঈমান গ্রহণ করত এবং আল্লাহকে ভয় করত।

কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা অনেকেই যাদুকরকে কাফের বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার অনেকেই মতামত প্রকাশ করেছেন যে, সে কাফের তো নয় তবে তার সাজা হলো শিরচ্ছেদ। কেননা ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহ) এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহেমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেন : আমাদেরকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমর ইবনে দীনারের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি বাজলা ইবনে আব্দকে বলতে শুনেছেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এ মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন যে, প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ ও নারীর শিরচ্ছেদ করে দাও। তিনি বলেন যে, তিনি তিনটি যাদুকর নারীকে হত্যা করেছেন। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) এভাবেই বিবরণ দিয়েছেন। (বুখারীর : ২/২৫৭)

ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : সহীহ বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যা হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তাকে তার এক বান্ধবী যাদু করেছেন। অত:পর তার নির্দেশে যাদুকরকে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এর তিন সাহাবা থেকে যাদুকরকে হত্যার ফতোয়া রয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর : ১/১৪৪)

মূলকথা : পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহু) ব্যতীত জমহুর উলামা যাদুকরকে হত্যা করার মত পোষণ করেন, তিনি বলেন : যাদুকরের যাদু দ্বারা যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে তার (কিসাসের) বদলে তাকে হত্যা করা হবে।

আহলে কিতাব বিধর্মী যাদুকরের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ

ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ) বলেন : যেহেতু হাদীসে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী উল্লেখ নেই সেজন্যে বিধর্মী যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। এ জন্য যে, যাদু এমন এক অপরাধ যা মুসলিমকে হত্যা করে। অনুরূপ এক অপরাধও বিধর্মীকে হত্যা করা আবশ্যক করে দেয়। (আলমুগনী : ১০/১১৫)

ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, আহলে কিতাবের যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না। তবে যদি তার যাদু দ্বারা কেউ মারা যায় তবে তাকে হত্যা করা হবে। আরও বলেন : তার যাদু দ্বারা যদি কোন মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ নেই তাকেও হত্যা করা জায়েয।

রাসূল করীম ﷺ লাবীদ ইবনে আসেমকে হত্যা এজন্য করেননি যে, তিনি নিজের জন্যে কারো প্রতিশোধ নিতেন না। লাবীদ রাসূল ﷺ কে যাদু করেছিল। দ্বিতীয় : এজন্যে হত্যা করেননি যে, কোথাও আবার ইয়াহুদী ও মুসলিমদের মাঝে রক্তাক্তরূপ ধারণ না করে। (ফাতহুল বারী : ১০/২৩২)

২. ইমাম কুরতুবী বলেন : এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মতবিরোধ রয়েছে। যাদু দ্বারা যাদুর দমন করে মানুষের চিকিৎসা করাকে সাঈদ ইবনে মুসইয়্যিব বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম মুযনীও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শা'বী বলেন : আরবি ভাষায় ঝাড়-ফুঁক হলে কোন দোষ নেই কিন্তু হাসান বাসরী (রহ) তা মাকরূহ বলেছেন। (কুরত্বী : ২/৪৯)

৩. ইবনে কুদামা (র) বলেন : যাদুর চিকিৎসক যদি কুরআনের আয়াত অথবা কোন যিকিরের মাধ্যমে অথবা এমন বাক্য দ্বারা চিকিৎসা করে যে, যাতে কোন

কুফুরির বিষয় নেই তবে কোন বাধা নেই; কিন্তু তা যদি যাদু দ্বারাই হয়ে থাকে তবে তা থেকে ইমাম আহমদ দ্বিমত পোষণ করেছেন। (আল-বুগনী : ১০/১১৪)

৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : নবী করীম ﷺ-এর বাণী–

اَلنُّشْرَةُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ, ঝাড়-ফুঁক শয়তানী কর্মের শামিল। (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)

এর উদ্দেশ্য হলো মৌলিকভাবে এটিই, তবে যার উদ্দেশ্য ভালো তাতে কোন দোষ নেই। ইবনে হাজার আসকালানী আরো বলেন : ঝাড়-ফুঁক দু'প্রকারের–

প্রথম : বৈধ ঝাড়-ফুঁক : এ পদ্ধতি হলো, যা কুরআন ও শরীয়তসম্মত দু'আর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা করা।

দ্বিতীয় : হারাম ঝাড়-ফুঁক : এ প্রকার হলো, যার মাধ্যমে যাদুকে যাদু দ্বারা নষ্ট করা হয়। অর্থাৎ যাদু নষ্ট করার জন্য শয়তানকে আনন্দ দেয়া হয় এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাসিল করে তার সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর রাসূল ﷺ-এর হাদীস–

اَلنُّشْرَةُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক শয়তানের কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এদিকেই ইঙ্গিত করে রাসূলে করীম ﷺ কয়েক হাদীসে গণক ও যাদুকরের নিকট গমন করতে নিষেধ করেন এবং তা কুফরী সাব্যস্ত করেন।

যাদু শিক্ষা করা কি জায়েয?

১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন যে, আল্লাহর বাণী–

اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ-

আমরা তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তোমরা কুফুরি করো না। (সূরা বাকারা : ১০২) আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদু শিক্ষা করা কুফর।

(ফতহুল বারী : ১০/২২৫)

২. ইবনে কুদামা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ এবং সকল আহলে ইলমও এ কথায় একমত যে, তা হারাম। ইমাম আহমদ

ইবনে হাম্বল (রাহেমাহুল্লাহ)-এর অনুসারীগণ বলেন যাদু শিখলে ও শিখালে কাফের হয়ে যায়। সে যদিও যাদুকে না জায়েয বলে বিশ্বাস করে।

(আল-মুগনী : ১০/১০৬)

৩. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাযি (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : যাদুর ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া ঘৃণিতও নয় নিষিদ্ধও নয়। কেননা সকল বিজ্ঞ পণ্ডিতদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, জ্ঞানার্জন সাধারণভাবে জায়েয। যেমন : আল্লাহর বাণী–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বলো : "জ্ঞানী ও মূর্খ কি এক সমান?" আরেকটি বিষয় হলো যে, যদি যাদু প্রসঙ্গে ধারণা না থাকে তবে আমরা যাদু ও মু'জেযার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করতে পারব। এ পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। তাই যাদুর হাসিল করা নিষিদ্ধ হতে পারে না। তবে তা প্রয়োগ করা যাবে না।

৪. ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) উপরিউক্ত ইমাম রাযীর অভিমত প্রসঙ্গে বলেন : কতগুলো কারণে তা গ্রহণীয় নয়। প্রথমত : যদি এ অভিমতকে বুদ্ধিভিত্তিক ও যৌক্তিক হিসেবে গ্রহণ করা হয় যে, যাদু শিক্ষা কোন খারাপ বিষয় নয় তবে কথা হল যে, মু'তাযিলা যারা যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয় তাদের কাছে যাদু শিক্ষা নিষিদ্ধ। আর যদি মনে করা হয় যে, শরীয়তে কোন নিষেধ নেই তবে এর জবাব হলো যে, আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ـ

অর্থ : তারা এমন বিষয়ের আনুগত্য করল যা সুলাইমান (আ)-এর যুগে শয়তান পড়ত। রাসূল ﷺ এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল।

আল্লামা রাযীর এ কথা বলা যে, যাদু নিষিদ্ধ নয় এর পক্ষে কোন সঠিক প্রমাণ নেই। আর যাদুকে মর্যাদাপূর্ণ ইলমের সাথে তুলনা করা এবং আল্লাহ তায়ালার এ বাণী–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ : বলুন জ্ঞানী ও মূর্খ কি এক সমান। (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা সঠিক নয়। কেননা এ আয়াতে শরীয়তসম্মত ইলমের বাহকদের প্রশংসা করা হয়েছে। যাদুকরের নয়।

আর এ বলা যে, মুজেযাকে জানতে হলে যাদু সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে সঠিক নয়, কেননা সর্বাপেক্ষা বড় মুজেযা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর প্রতি নাযিলকৃত কুরআন। আর যাদু ও মুজেযার মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। আরও বিষয় হলো যে, সাহাবা, তাবেঈন এমন সকল মুসলিম মুজেযা সম্পর্কে জানতেন তারা যাদু প্রসঙ্গে ধারণা রাখার দরকার মনে করেননি।

(তাফসীর ইবনে কাসীর: ১/১৪৫)

৫. আল্লামা আবু হাইয়ান নিজ গ্রন্থ বাহরুল মুহীত-এ উল্লেখ করেছেন যে, যাদু যদি এমন হয় যে তাদ্বারা শিরক করা হয় অর্থাৎ শয়তানের ও তারকায় বড়ত্ব বর্ণনা ও পূঁজা করা হয়, তবে তা শিক্ষা করা সকলের ঐক্যমতে হারাম। তা শিক্ষা করা ও তার ওপর আমল করা হারাম। অনুরূপ যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় রক্তপাত, স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি। তা শিক্ষা করা ও আমল করা না জায়েয।

আর যা কিছু ভণ্ডামী ও ভেল্কিবাজী ও এ জাতীয় কিছু তা শিক্ষা করাও উচিত নয়, কেননা তা ভ্রান্ত ও বাতিল যদিও তা দ্বারা খেল-তামাশা উদ্দেশ্য নেয়া হয়।

(রাওয়ে বয়ান : ১/৮৫)

উপরিউক্ত সমস্ত বক্তব্যের মূল কথা হলো : যাদু যে ধরনেরই হোক তার সম্পর্ক খেল-তামাশাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় অবৈধ।

কেরামত, মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য

আল্লামা মাযরী বলেন : যাদু, মুজেযা এবং কেরামতের মধ্যে পার্থক্য হলো, যাদুর মধ্যে যাদুকর কিছু মন্ত্র ও কর্মের বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজ স্বার্থ হাসিল করে থাকে। অন্যদিকে কেরামত হঠাৎ অলৌকিকভাবে ঘটে থাকে। আর মুজেযা কেরামত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এজন্য যে, তা দ্বারা প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহেমাহুল্লাহ) ইমামুল হারামাইনের বরাত দিয়েছেন উল্লেখ করেন যে, সকলের একমত যাদু শুধুমাত্র ফাসেকের অতি পাপী হাত দ্বারাই প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কেরামতের প্রকাশ কোন ফাসেকের হাতে হয় না।

ইবনে হাজার আসকালানী (র) আরও বলেন, সকলকেই সচেতন থাকতে হবে যে, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ বিষয়াদি কোন শরীয়তের অনুগত কবীরা গুনাহ মুক্ত

লোকের নিকট থেকে প্রকাশ পায় তা হবে কেরামতের অন্যথায় তা হবে যাদু। কেননা যাদু শয়তানের সাহায্যে হয়ে থাকে।

নোট : কোনো কোনো সময় এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যাদুকর নয় এমন কি যাদু প্রসঙ্গে কিছুই জানে না, শরীয়তের যথাযথ অনুসারীও নয় বরং বড় বড় পাপ কর্ম করে থাকে, অথবা কবর পূজারী ও বেদআতী এরপরও দেখা যায় যে, তার থেকে অলৌকিক কিছু ঘটছে।

এর রহস্য হলো যে, তাকে শয়তান সহযোগিতা করে থাকে যাতে সাধারণ মানুষ তার বিদআতী পন্থায় আকৃষ্ট হয়। আর মানুষের এ সুন্নাতকে ছেড়ে শয়তানী পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। এ জাতীয় কাহিনী অনেক, বিশেষ করে সুফীপন্থী নেতাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৬. যাদুর প্রতিকার

যাদুকে দমন করার নিয়ম

আলোচ্য অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ যাদুর দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রকারভেদ ও এর প্রতিকার কুরআন ও হাদীসের আলোকে কি নিয়মে হবে তা নিয়ে আলোচনা করব। প্রকাশ থাকে যে, এ অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে চিকিৎসা বিষয়ে আরো অনেক এমন বিষয়ও পাওয়া যাবে যা রাসূল ﷺ থেকে বিশেষ কোন চিকিৎসার বিষয়ে সরাসরি সাব্যস্ত নয় তবে সেই মৌলিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যাবে যা কুরআন ও হাদীসে সাব্যস্ত। যেমন : কোন এক চিকিৎসা একটি আয়াত বা বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে থাকতে পারে। কাজেই তা সবগুলোই নিম্নের আয়াতের নির্দেশনার আওতায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ.

অর্থ : আর আমার নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতে ঈমানদারের জন্যে আরোগ্য এবং রহমত রয়েছে। (সূরা ইসরা : আয়াত-৮২)

কোন কোন ইমাম বলেন : আয়াতে শিফা বা আরোগ্য বলতে আভ্যন্তরীণ আরোগ্যকে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ সংশয়, শিরক, কুফর ইত্যাদি রোগের আরোগ্য। কেউ বলেন : শরীরিক ও আত্মিক উভয় রোগের আরোগ্য।

অন্য এক হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তার নিকট আসলেন; সে সময় তাঁর নিকট এক মহিলা বসা ছিলেন, যে তাঁর ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করছিলেন। নবী ﷺ বললেন : "তাকে কুরআন দ্বারা চিকিৎসা কর। (নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সহীহ বলেছেন : ১৯৩১)

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নবী ﷺ কুরআনের কোন বিশেষ অংশের মাধ্যমে চিকিৎসার নির্দেশ না দিয়ে সাধারণভাবে কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। তা দ্বারা বুঝা গেল যে, গোটা কুরআন আরোগ্য হাছিলের পন্থা। বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত যে, কুরআন শুধুমাত্র, যাদু, বদনজর ও হিংসারই চিকিৎসা নয়; বরং শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও চিকিৎসা রয়েছে এতে।

কেউ যদি বলে : আগ্রহী যুবকবৃন্দ সে সব আয়াত দ্বারা রাসূল ﷺ চিকিৎসা করেছেন সেসব আয়াতের মাধ্যমেই চিকিৎসা করতে চায়, তাই নব প্রজন্মের অবগতির জন্যে সহীহ বুখারীর নিম্নেবর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করছি।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবাদের সাথে ছিলেন। তারা একত্রে এক উপত্যকা সফর করছিলেন। সেই উপত্যকার বাসিন্দার নিকট আতিথেয়তার আবেদন জানালেন, কিন্তু তারা তা কবুল করল না। অত:পর গোত্র প্রধানকে কোন বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিল। তখন সেখানের লোকজন দৌড়ে সাহাবাদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে ঝাড়-ফুঁক জানে?

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন যে, আমি জানি তবে আমি ঝাঁড়-ফুঁক করব না যতক্ষণ না তোমরা এর প্রতিদান নির্ধারণ করবে। প্রতিদান নির্ধারণ হওয়ার পর তিনি ঝাড়লেন এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠল। এরপর তারা সাহাবাদেরকে ছাগল দিলেন। তারা ছাগল নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে সব কাহিনী খুলে বললেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কিভাবে ঝাড়-ফুঁক করেছিলে? জবাবে বললেন, সূরা ফাতেহা পড়ে। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কিভাবে জানতে পারলে সে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভ হয়? আর নবী ﷺ তার এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি; বরং এর প্রশংসাই করেছেন।

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকার পরেও ঝাড়-ফুঁক করেছেন। আর নবী ﷺ তা সমর্থন করে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁকের সাধারণত কিছু মৌলিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করল যে আমরা অন্ধকার যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তিনি বললেন, সেসব মন্ত্র আমার নিকট উপস্থাপন কর। ঝাড়-ফুঁক করাতে নিষেধ নেই যদি তাতে কোন শিরকযুক্ত বাক্য না থাকে। আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঝাড়-ফুঁক জায়েয তা কুরআন ও হাদীস দিয়ে হোক অথবা অন্য দুআর মাধ্যমে হোক এমনি অন্ধকার যুগের ঝাড়-ফুঁক দিয়েও যদি তাতে শিরক না থাকে।

যাদুর প্রকার ও তার প্রতিকার

১. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর যাদু

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন−

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَاهُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : তারা সে সব ব্যাপারে অনুগত হয়ে গেল যেসব বিষয় শয়তান সুলায়মান (আ.)-এর শাসনামলে পড়ত। অথচ সুলায়মান (আ.) কখনও কুফুরি করেননি; বরং শয়তান কুফুরী করত এবং শয়তান লোকদের যাদু শিক্ষা দিত এবং বাবেলে হারুত-মারুতের প্রতি নাযিল হয়েছিল তা শিখত। আর সেই দুই ফেরেশতা কাউকে কোন কিছু শিখাতো না যতক্ষণ না তারা সতর্ক করে দিত যে, আমরা তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই তোমরা কুফরি করো না। তবুও তারা তাদের নিকট থেকে এমন বিষয় শিক্ষা নিত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ

ঘটানো হয়। আর তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া কাউকে অনিষ্ট করতে পারবে না। আর তারা আলাভজনক ক্ষতিকর বিষয়গুলো শিক্ষা নিত। অথচ তারা জানত যে নিশ্চয় যে ব্যক্তি এ সব ক্রয় করে তাদের জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। আর কত নিকৃষ্ট বিষয় ক্রয় করেছে যদি তা তারা উপলব্ধি করত।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ইবলীস তার আস পানিতে (সমুদ্রে) এবং সে তার বাহিনীকে অভিযানে পাঠিয়ে আর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শয়তান হয়, যে সবার থেকে বেশি ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। অতি শেষে সকলেই অভিযানের সফলতা সরদার শয়তানের নিকট উপস্থাপন করতে থাকে। অতঃপর সরদার বলে, তোমরা কেউ কোন বড় ধরনের কাজ করে আসতে পারনি। অত:পর সরদারের নিকট এক ছোট শয়তান এসে বলে আমি অমুক লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িনি যতক্ষণ না আমি তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, শয়তানের সরদার সেই ছোট শয়তানকে কাছে নিয়ে বলে, তুমি কতইনা উত্তম। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, বড় শয়তান ছোট শয়তানের সাথে আলিঙ্গন করে। (মুসলিম)

এ প্রকারের পরিচয়

এটি যাদুর এমন এক কর্ম যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ বা দুটি মাঝে বা দু'অংশীদারের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

যাদুর মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর শ্রেণীভেদ

১. মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।
২. পিতা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো
৩. দু'ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।
৪. বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।
৫. ব্যবসায় অংশীদারদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।
৬. স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো। আর এ প্রকারটি সর্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং তা অধিক প্রচলিত।

বিচ্ছেদের যাদুর আলামত

১. হঠাৎ ভালোবাসা থেকে শত্রুতায় পরিণত হওয়া।
২. উভয়ের মাঝে বেশি-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।
৩. পরস্পর ক্ষমা না চাওয়া ও ক্ষমা না করা।

৪. অতিমাত্রায় মতনৈক্য সৃষ্টি হওয়া যদিও তা সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে।

৫. স্ত্রীর সৌন্দর্য অসুন্দরে পরিণত হওয়া। যদিও সে খুবই সুন্দরী হোক স্বামীর নিকট খারাপ মনে হওয়া। আর স্ত্রীর কাছে স্বামী নিকৃষ্ট উপলব্ধি হওয়া।

৬. যাদুগ্রস্তের নিকট অপর জনের প্রত্যেক কর্মই অপছন্দ হওয়া।

৭. যাদুগ্রস্ত অপর পক্ষের বসার স্থানকে অপছন্দ করা। যেমন : স্বামী গৃহের বাইরে অধিক ভালো থাকে, ঘরে প্রবেশ করলেই অন্তরে অতি সংকীর্ণতাবোধ করে। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার যাদুর ফলে যাদুগ্রস্ত অপরজনকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে বা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে বা এ জাতীয় অন্যান্য বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বিষয়ে পতিত হবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর-১/১৪৪)

দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদের জন্য যাদু যেভাবে করা হয়

কোন ব্যক্তি যখন যাদুকরের নিকট গমন করে বলে যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। তখন যাদুকর তাকে সেই ব্যক্তির নাম ও তার মায়ের নাম জানাতে বলে। এছাড়া সেই ব্যক্তির পোশাক, টুপি, চুল ইত্যাদি নিয়ে আসতে বলে। আর যদি এসবগুলো পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে সেই ব্যক্তির রাস্তায় যাদু করা পানি ঢেলে দেয়া হয় যে রাস্তায় উদিষ্ট ব্যক্তি চলাফেরা করে। আর সেই পানি অতিক্রম করা মাত্রই যাদুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়। অথবা এমনও করা হয় যে, খাদ্যদ্রব্য যাদু করে ভক্ষণ করতে দেয়া হয়।

চিকিৎসা

তিনটি স্তরে এর চিকিৎসা করতে হবে–

প্রথম স্তর চিকিৎসার পূর্বের স্তর

১. ঘরে ঈমানী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যেমন : সর্বপ্রথম সে ঘরকে সকল ধরনের ছবি থেকে পবিত্র করতে হবে যেন রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে।

২. ঘরকে সকল ধরনের গান-বাজনা থেকে পবিত্র করতে হবে।

৩. ঘরের কেউ শরীয়তের বিধান অমান্য করবে না। যেমন : পুরুষ সোনা পরবে না আর নারী বেপর্দা থাকবে না এবং কোন ব্যক্তি ধূমপান করবে না।

৪. রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তাবীজ-কবচ, কড়ি বা এ জাতীয় কিছু থাকলে তা খুলে জ্বালিয়ে দিবে।

৫. পরিবারের সকলকেই বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী হিসেবে তৈরি হওয়া। যেন সবাই এর জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক না রাখে।

৬. রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার অবস্থা নির্ণয় ও তার লক্ষণ বুঝার জন্য। যেমন : তোমার স্ত্রীকে কি কখনও তোমার কাছে ঘৃণা লাগে? তোমাদের মাঝে কি সাধারণ ও সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়? তুমি কি ঘরের বাহিরে আনন্দ উপলব্ধি করো? আর যখনই ঘরে প্রবেশ করো তখনই কি সমস্যা অনুভব হয়? সহবাসের সময় কি কারো বিরক্ত বোধ হয়? ঘুমের মাঝে কি তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ অস্থিরতা অনুভব বা ভীতিজনক স্বপ্ন দেখতে পায়?

চিকিৎসক উপরিউক্ত প্রশ্নাবলী থেকে দু'টি বা ততোধিক যদি সঠিক হয় তবে চিকিৎসা আরম্ভ করবে।

৮. অসুস্থ রোগী যদি মহিলা হয়ে থাকে, তবে পর্দা অবস্থায় না হলে চিকিৎসা করবে না।

৯. কোন এমন নারীর চিকিৎসা করবে না, যে শরীয়ত পরিপন্থী পোশাকে রয়েছে যেমন : মুখ খোলা, সুগন্ধি ব্যবহৃত অবস্থায় বা নখ বড় করে কাফের নারী সদৃশ রয়েছে।

১০. নারীর চিকিৎসা তার মাহরামের (একান্ত আপনজন) উপস্থিতিতে হতে হবে।

১১. মাহরাম ছাড়া অন্য পুরুষ তার সাথে থাকতে পারবে না।

১২. সফলতার জন্যে নিজকে সকল কলুষতা ও অন্যের প্রতি সকল আস্থা থেকে মুক্ত রাখবে। আর একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে ও তার ওপরেই আস্থা রাখবে।

চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তর

রোগীর মাথায় চিকিৎসক তার হাত রাখবে এবং তার কানের কাছে এ সব দু'আ ও আয়াত সতর্কতার সাথে এবং বিশুদ্ধ ও উচ্চস্বরে পড়বে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

অর্থ : অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এর অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে। অতি দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের পালনকর্তা। যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারি ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই প্রার্থনা করি। হে রব! আমাদের সরল পথ দেখাও, সেসব ব্যক্তিদের পথ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। সেসব ব্যক্তির পথ নয় যাদের ওপর তোমার অভিশাপ রয়েছে, আর গোমরাহী পথ। (সূরা ফাতেহা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ، ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ গ্রন্থে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পরহেযগারি হেদায়াত (পথ-প্রদর্শক)। যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও আমার দেয়া সম্পদ থেকে (মানব কল্যাণ করে। আর যারা আপনার প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের (কুরআনের) আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই-এমন লোক যারা পক্ষ থেকে (পথ প্রদর্শিত) হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলতার অধিকারী। (সূরা বাকারা : আয়াত-১-৫)

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ

مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করে তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফুরী করেননি : শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা জনগণকে যাদু বিদ্যা এবং শহরে হারূত-মারূত ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রতি নাযিল হয়েছিল তা শিক্ষা দিত এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিত না, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না; অনন্তর যাতে স্বামী ও স্বীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত এবং তারা আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া তদ্বারা কারও ক্ষতি করতে পারত না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকারে আসে না এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা কিনেছে, তার জন্যে আখিরাতে কোনই অংশ নেই এবং তার বিনিময়ে তারা যে আত্মনা বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানতো। (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

এ আয়াতটি অধিক পরিমাণে পড়বে।

৪.

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

অর্থ : এবং তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা ও করুণাময় ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, জাহাজসমূহের চলাচলে- যা মানুষের লাভজনক এবং সম্ভার নিয়ে

সমুদ্রে চলাচল করে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত করেন তাতে, প্রত্যেক জীবজন্তুর বিস্তার করেন তাতে, বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় সত্য জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৩-১৬৪)

৫.

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَالَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তিনি চিরজীবন্ত ও সবার রক্ষণা-বেক্ষণাকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই, এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি জানেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না; তাঁর কুরসী আসমান ও যমীনের পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।

(সূরা বাকারা : আয়াত- ২৫৫)

৬.

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

অর্থ : রাসূল তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করেন); তাঁরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর গ্রন্থসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও স্বীকার করলাম, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; কারণ সে যা আয় করেছে তা তারই জন্যে এবং সে যা (অন্যায়) করেছে তা তারই উপর বর্তায়। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা না জেনে ভুল করি তজ্জন্যে আমাদেরকে দোষারোপ করবেন না, হে আমাদের পালনকর্ত! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেরূপ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের ওপর তদ্রূপ দায়িত্ব অর্পণ করবেন না; হে আমাদের রব! যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের দয়া করুন; আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা বাকারা : আয়াত- ২৮৫-২৮৬)

৭.

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَآئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

অর্থ : আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত সত্য কেউ ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায় নিষ্ঠ বিদ্যানগণ ও (সাক্ষ্য প্রদান করেন) তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল এবং যে আল্লাহর নিদর্শনগুলো অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮-১৯)

৮.

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ـ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْیَةً ط اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ـ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ـ

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের ক্ষতি থেকে নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন দিনে অত:পর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিন-রাতের প্রত্যয় করেন। আর সূর্য চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁরই নির্দেশে অনুগত। গোটা সৃষ্টি জগত তাঁরই। বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আল্লাহ তিনি মহান। তোমাদের প্রভুকে বিনয়ের সাথে এবং গোপনে ডাক। সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না এবং তাকে ডাক ভয়ে ও আশায়। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত ব্যক্তিবর্গের জন্যে অবধারিত। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৫৪-৫৬)

৯.

وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَاْفِكُوْنَ ـ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ـ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ

وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ـ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ـ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর মূসা (আ.)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছি। আপনি আপনার লাঠি মাটিতে ফেলে দিন। দেখামাত্র সাপে পরিণত যাদুকরদের যাদুর সাপ গিলে ফেলছে। ফলে সত্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠিত হলো। ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তাদের কর্ম। সেখানে তারা পরাজিত হলো এবং রাঞ্ছিত হলো যাদুকাররা সিজদাবনত হলো। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। বিশ্ব জগতের ওপর যিনি মূসা ও হারুনেরও পালনকর্তা। (সূরা : আরাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

আয়াতগুলো অধিক পরিমাণে পড়বে, বিশেষ করে وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ অংশটি।

১০.

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ، وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

অর্থ : মূসা (আ) বললেন, তোমরা সে যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। মহান আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ্ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা ভালোবাসে না। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮১-৮২)

এটিও অধিক পরিমাণে পড়বে, বিশেষ করে : اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ অংশটি অধিক পরিমাণে পড়বে।)

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَّلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى.

১১. অর্থ : তারা শুধুমাত্র যাদুকরের ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করেছে। আর যাদুকর সফলকাম হবে না তারা যাই করুক। (সূরা ত্বাহা : আয়াত-৬৯)

১২.

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ، فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ : তোমরা কি এ ধারণা পোষণ করছ যে, তোমাদেরকে আমি অযথা সৃষ্টি করেছি। আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে না। অতএব আল্লাহ্ মহান যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর তিনি মোবারক আরশের রব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তার ওপর কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তাঁর প্রভুর নিকট আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। বলুন : হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমতকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমতকারী।

(সূরা মু'মিনুন : আয়াত-১১৫-১১৮)

১৩.

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ، وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔

অর্থ : কসম তাদের যারা (ফেরেশতাগণ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। ও যারা কঠোর পরিচালক (মেঘমালার)। এবং যারা কুরআন তিলাওয়াতে রত। নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তবর্তী

সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা সকল উদয় স্থলের। আমি পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্ররাজি শোভা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে, তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে পারে না এবং তাদের প্রতি (জ্বলন্ত তারকা) নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ ছোঁ মেরে কিছু শ্রবণ করলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত : আয়াত-১-১০)

১৪.

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ، قَالُوْا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ، يَا قَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ، وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ، اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ .

অর্থ : স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতেছিল, যখন তারা তাঁর (নবীর) নিকট হাজির হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগল : চুপ করে শুন। যখন কুরআন তিলাওয়াত শেষ হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে- তারা বলেছিল : হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক গ্রন্থের তিলাওয়াত শুনেছি যা নাযিল হয়েছে মূসা (আ)-এর পরে, এটা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে জগতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।

(সূরা আহকাফ : আয়াত-২৯-৩২)

১৫.

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَن تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ، فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

"হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ছাড়া। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা রহমান : আয়াত-৩৩-৩৬)

১৬.

لَوْاَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ، هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ، هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ : যদি আমি এ কুরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব উপামা বর্ণনা করি মানুষের জন্যে যাতে তারা চিন্তা করে। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোন

ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, যারা তার অংশীদার স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা হাশর : আয়াত-২১-২৪)

১৭.

قُلْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا، يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا، وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا، وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا، وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا، وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا، وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا، وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا، وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا.

অর্থ : বল! আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে : আমরা তো এক আশ্চর্য ধরনের কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার কোন অংশীদার স্থাপন করবো না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের পালনকর্তার মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর ব্যাপারে অতি বাস্তব উক্তি করত। অথচ আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না। আর কিছু সংখ্যক মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয়

প্রার্থনা করত, ফলে তারা জ্বীনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (আর জ্বীনেরা বলেছিল) তোমাদের মতো মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য জোগার করতে; কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্যে বসতাম; কিন্তু এখন কেউ খবর শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। (সূরা জ্বিন : আয়াত-১-৯)

১৮. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থ : বল! তিনিই আল্লাহ্ একক (ও অদ্বিতীয়), আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী); তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (সূরা ইখলাস)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

অর্থ : বল! আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষতি থেকে, ক্ষতি থেকে রাত্রির যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; এবং ঐ সব নারীর ক্ষতি থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয়, (অর্থাৎ যাদু করার উদ্দেশ্যে) এবং ক্ষতি থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، اِلٰهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

অর্থ : বল! আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের পালনকর্তার, যিনি মানবমণ্ডলীর মালিক (বা অধিপতি) যিনি মানবমণ্ডলীর উপাস্য; আরো গোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার ক্ষতি থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বীনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে। (সূরা নাস)

উপরিউক্ত সমস্ত আয়াত ও সূরা রোগীর কর্ণপার্শ্বে উঁচু আওয়াজে এবং বিশুদ্ধভাবে পড়বে। এরপর রোগীর তিনটি অবস্থার যে কোন একটি হতে পারে। প্রথমত :

হয়তো রোগী বেঁহুশ হয়ে পড়ে যাবে এবং সে যেই জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত যে যাদুর দায়িত্বে সেই জ্বীন কথা বলতে থাকবে। এমতাবস্থায় চিকিৎসক জ্বীনের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেয়া উচিত সে ব্যবস্থা নিবে, যা আমি আমার অন্য গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এরপর সে জ্বীনকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবে ।

১. তোমার নাম কি? আর তোমার ধর্ম কি? ধর্মের ওপর নির্ভর করে কথা বলতে হবে। যদি সে বিধান হয়ে থাকে তবে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে ডাকবে আর যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে তবে তাকে বুঝাবে যে, তোমার জন্য এটা জায়েয নয় যে, তুমি যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত থাক। আর না ইসলাম এর অনুমতি দেয়।

২. তাকে প্রশ্ন করবে যে, যাদু কোথায় রয়েছে? তাকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করতে হবে। কেননা জ্বীন সব সময় মিথ্যা বলে। সে যদি কোন স্থানে সংবাদ দেয় তবে লোক প্রেরণ করে তা বের করতে হবে।

৩. ওকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সে কি একাই যাদুর সাথে জড়িত না কি আরও কেউ তার সাথে রয়েছে? যদি অন্য আরও জ্বীন থাকে তবে তার মধ্যে সেই জ্বীনকেও হাজির হতে বাধ্য করবে। অত:পর তার কথাও শ্রবণ করবে।

৪. কখনও জ্বীন বলবে যে, অমুক ব্যক্তি যাদুকরের কাছে গিয়ে যাদু করতে বলেছে। এমন সব কথাও বিশ্বাস করা যাবে না। কেননা জ্বীনদের উদ্দেশ্য হলো দুই ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা বাড়ানো আর শরীয়তে এসব জ্বীনের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কেননা যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত ফাসেক সে।

আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ.

অর্থ : হে মু'মিন ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের নিকট কোন ফাসেক কোন খবর নিয়ে আসলে তা সূক্ষ্মভাবে তদন্ত কর যাতে করে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার না কর। অত:পর তোমরা কৃতকর্মে লজ্জিত হও।

(সূরা হুজরাত : আয়াত-৬)

জ্বীনের তথ্যানুযায়ী যদি সেই যাদুর জায়গা পাওয়া যায় আর তা বের করা হয়। তবে পানিতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করবে–

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ، وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ، قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ .

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর মূসা (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি আপনার লাঠি মাটিতে ফেলে দিন। দেখামাত্র সাপে পরিণত হয়ে যাদুকরদের যাদুর সাপ গিলে ফেলছে। সত্যের বিজয়ও প্রতিষ্ঠিত হলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তাদের কর্ম। সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে এবং অপদস্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। সকল যাদুকর সেজদাবনত হলো। তারা বলল : আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম গোটা জগতের পালনকর্তার ওপর, যিনি মূসা ও হারুনের প্রভু। (সূরা আরাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَّلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى.

অর্থ : তারা তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদু করের কৌশল যাদুকর সেথায়ই আসুক হবে না। (সূরা ত্বাহা : আয়াত-৬৯)

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ، وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

অর্থ : মূসা (আ) বললেন, তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ্ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা ভালোবাসে না। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮১-৮২)

এসব আয়াত একপাত্র পানিতে পড়ে ফুঁক দিয়ে যাতে কুরআন পড়া ভাপ পানিতে যায়। এরপর যাদুকে সেই পানিতে ডুবিয়ে দিবে তা যেন কোন ধরনের যাদুর

বস্তুই হোক কাগজ বা সুগন্ধি ইত্যাদি। এরপর সেই পানিকে সাধারণ রাস্তা থেকে অনেক দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। যদি জ্বীন বলে যে, যাদু আক্রান্ত রোগীকে যাদু পান করিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার পেটে ব্যাথা আছে কি না? যদি ব্যাথা থাকে তবে বুঝতে হবে যে, জ্বীন সত্য বলেছে আর ব্যাথ্যা না থাকলে বুঝতে হবে যে, জ্বীন মিথ্যা বলেছে।

যদি জ্বীন থেকে সত্য তথ্য সংগ্রহ করা শেষ হয় তখন জ্বীনকে বলবে রোগী থেকে বের হয়ে যেতে এবং আর কখনও যেন প্রত্যাবর্তন না করে। এমনিভাবেই ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস করা যাবে। অত:পর পানিতে ইতিপূর্বে যে তিনটি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তা পাঠ করবে এবং সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দিবে। রোগীকে তা দ্বারা কিছুদিন গোসল ও পান করতে বলবে আর যদি জ্বীন বলে যে, রোগী যাদুর বস্তুর উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে অথবা তার কোন কিছু যেমন চুল, পোশাক দিয়ে যাদু করেছে তাহলে এমতাবস্থায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা পানি পড়া থেকে কিছুদিন রোগী পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করে নিবে। গোসল বাথরুমে না করে বরং বাথরুমের বাইরে যে কোন স্থানে করবে এভাবে ব্যাথা দূর না হওয়া পর্যন্ত করতে থাকবে।

এরপর জ্বীনকে বলবে যে, সে যেন এ ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যায় আর ফিরে না আসার ওয়াদা করে। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ পর রোগী দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে আসলে জ্বীন উপস্থিত করার জন্যে পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ দ্বিতীয়বার পাঠ করবে। যদি অসুস্থ ব্যক্তি কোন কিছু অনুভব করে। তবে বুঝতে হবে যে, যাদু ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি রোগী আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তবে বুঝতে হবে যে, জ্বীন মিথ্যাবাদী এবং এখনও সে রোগী থেকে বের হয়ে যায়নি। ওকে বের না হওয়ার কারণ নম্রতার সাথে জিজ্ঞাসা করবে। আর যদি এরপরও কথা অমান্য করে তবে প্রহার করবে এবং কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করবে। যদি রোগী অজ্ঞান না হয় এবং তার দেহে কাঁপন শুরু হয় এবং তার নি:শ্বাস ফুলতে থাকে তবে আয়াতুল কুরসীর ক্যাসেট রোগী প্রতিদিন তিনবার প্রতিবার এক ঘণ্টাব্যাপী শোনবে। এভাবে একমাস শুনবে তারপর পুনরায় সাক্ষাতে আসলে তাকে ঝাড়-ফুঁক দিবে। এবার ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

আর যদি সুস্থ না হয় তবে সূরা সাফফাত, ইয়াসীন, দুখান, সূরা জ্বীন এসব সূরার রেকর্ডকৃত ক্যাসেট দিবে যাতে করে দিনে তিনবার তিন সপ্তাহ পর্যন্ত শুনবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করে দিবেন। আর না হয় সময়সীমা বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা

ঝাড়-ফুঁকের সময় রোগী যদি কষ্ট অনুভব করে অথবা কাঁপতে থাকে, ঝাঁকুনি আসে অথবা মাথায় অধিক ব্যাথা অনুভব করে অজ্ঞান না হয়, তবে এ অবস্থায় তিনবার করে দেহে ঝাড়-ফুঁক করবে। যদি রোগী বেহুঁশ হয়ে যায় তবে পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করবে। আর যদি অজ্ঞান না হয় মাথা ব্যাথ্যা ও কাঁপনি কমতে থাকে তবে কিছুদিন তাকে ঝাড়-ফুঁক করবে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই সে আরোগ্য লাভ করবে। যদি সুস্থ না হয়, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোই গ্রহণ করবে-

১. সূরা সাফফাত সম্পূর্ণ একবার এবং আয়াতুল কুরসী একাধিকবার রেকর্ড করবে। এরপর রোগীকে দিনে তিনবার শোনাবে।

২. জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে।

৩. রোগী ফজর নামাযের পর নিম্নের এ দু'আ

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَاشَـرِيْـكَ لَـهٗ، لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ وَهُـوَ عَلٰـى كُلِّ شَـيْـئٍ قَـدِيْـرٌ.

একশত বার করে এক মাস পর্যন্ত পাঠ করবে; কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগীর কষ্ট ১০ অথবা ১৫ দিন পর্যন্ত বাড়তে পারে; কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং মাসের শেষে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে।

এবার যখন পুনরায় ঝাড়-ফুঁক করবে তাতে রোগী কোন কষ্ট অনুভব করবে না। ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, অসুস্থ রোগীর কষ্ট এক মাসেও লাঘব হয়নি। সাথে সাথে রোগীর উদ্বেগও থাকে। এ অবস্থায় যখন রোগী চিকিৎসকের নিকট আসবে তাকে তখন পূর্বের উল্লেখিত আয়াত ও সূরাগুলো পড়ে ফুঁক দিবে। এরপর অচিরেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। অত:পর প্রথম অবস্থায় পূর্বের পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

তৃতীয় অবস্থা

যদি ঝাড়-ফুঁক করার সময় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয়; তবে তাকে পুনরায় তার লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে এরপর যদি বেশির ভাগ লক্ষণই অবর্তমান হয়, তবে বুঝতে হবে সে যাদুগ্রস্ত বা অন্য কোন রোগী নয়। অবস্থা নিশ্চিত হবে, অত:পর তিনবার করে ঝাড়-ফুঁক করবে এরপরও যদি লক্ষণ ফুটে না ওঠে আর বার বার ঝাড়-ফুঁক করা হয়; কিন্তু কিছুই অনুভব না করে, তবে এ অবস্থা খুবই কম।

এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করবে :

১. সূরা ইয়াসীন, দুখান এবং সূরা জ্বীন ক্যাসেটে রেকর্ড করাবে এবং তা প্রত্যেক দিন তিনবার রোগীকে শোনানো হবে।

২. অধিক পরিমাণে তাওবা ও ইস্তেগফার করবে কমপক্ষে দিনে ১০০ বার অথবা বেশি।

৩. প্রত্যেক দিন ১০০ বার অথবা এর থেকে বেশি (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পাঠ করবে। এ পদ্ধতি একমাস পর্যন্ত করতে থাকবে। তারপর তার উপর ঝাড়-ফুঁক করবে এবং আগের দুই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে।

তৃতীয় স্তর

চিকিৎসার তৃতীয় স্তর হলো চিকিৎসা শেষের পরের স্তর

আল্লাহ্ তা'আলা যদি আপনার চেষ্টায় রোগীকে আরোগ্য করে দেন আর রোগী প্রশান্তি লাভ করে তাহলে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যিনি আপনাকে এ অবকাশ দিয়েছেন। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে হবে যেন আল্লাহ্ আপনাকে অন্যের জন্যও আরো তাওফীক প্রদান করেন। আর আপনার চিকিৎসায় এ সফলতা যেন আপনার সীমালঙ্ঘনও গর্বের কারণ না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন—

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

অর্থ : আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা (আপনার পালনকর্তা) প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তবে আমি তোমাদেরকে আরও বৃদ্ধি করে দিব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ যে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৭)

আর রোগী আরোগ্য লাভের পরও আশঙ্কা মুক্ত নয়, কোথাও আবার কেউ দ্বিতীয়বার তার যাদু পুনরাবৃত্তি না করে। কেননা যারা যাদু করিয়েছে তারা যদি তার চিকিৎসকের নিকট গমন করে সুস্থ হওয়ার বিষয় জানতে পারে তবে তারা দ্বিতীয়বার যাদুকরের নিকট গমন করে যাদু করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং রোগী তা চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার বিষয় গোপন রাখবে। আর রোগীর সুরক্ষার জন্যে নিম্নের নির্দেশাবলি তাকে প্রদান করুন—

১. জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা।

২. গান-বাজনা না শুনা।

৩. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ওযূ করে নেয়া এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।

৪. সব কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করা।

৫. ফজরের নামাযের পর দৈনিক নিম্নের দু'আ ১০০ বার পড়া।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

৬. দৈনিক সামান্য হলেও কুরআনের তিলাওয়াত অবশ্যই করা। যদি কুরআন তিলাওয়াত না জানে তবে অন্য কারো থেকে অথবা ক্যাসেটে শুনবে। (কুরআন কারীমের শিক্ষা গ্রহণ করবে। কেননা মুসলমানদের জন্য তা অবশ্যই জরুরি।)

৭. সৎব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে ওঠা-বসা করবে।

৮. সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন দু'আসমূহ পাঠ করবে।

৭. যাদু দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানোর শিক্ষামূলক কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত

প্রথম উদাহরণ : শাকওয়ান জ্বীনের কাহিনী

এক নারী তার স্বামীকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। যার ওপর যাদুর প্রভাব ও আলামত অনেক স্পষ্ট ছিল। এমনকি সে তার স্বামী এবং তার বাড়ির সংসারকে চরম ঘৃণা করত। আর তার স্বামীকে খুব ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখত। পরিশেষে তার স্বামী তাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেল; যে কুরআনে কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা করে। সেখানে জ্বীন কথা বলা আরম্ভ করল ও বলল : সে যাদুকরের মাধ্যমে এসেছে, তার দায়িত্ব হলো এ লোকটি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। এরপর চিকিৎসক তাকে অনেক প্রহার করল; কিন্তু তারপরও কোন ফল হলো না; এমন কি নারীর স্বামী আমাকে বলল, সে সে চিকিৎসকের নিকট দীর্ঘ একমাস ব্যাপী যেতে থাকে।

পরিশেষে একদিন সে জ্বীন আবদার করল যে, এ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, যদিও এক তালাক তবে আমি তাকে ছেড়ে যাব। দু:খের সাথে বলতে হয় যে, সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেয়। এরপর আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিল। ফলে মাঝখানে এক সপ্তাহ সম্পূর্ণরূপে মহিলাটি সুস্থ থাকল। এরপর নারীর ওপর পূর্বের অবস্থা ফিরে আসল। এরপর সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসল। আমি যখন কুরআন পড়তে লাগলাম তখন সে

অজ্ঞান হয়ে গেল। আর নিম্নের কথোপকথন জ্বীন ও আমার মাঝে চলতে লাগল যা আমি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি–

আমি জ্বীনকে বললাম যে, তোমার নাম কি?

জবাবে সে বলল : শাকওয়ান।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তোর ধর্ম কি?

সে বলল : খ্রিষ্টান ধর্ম।

আমি জানতে চাইলাম এ নারীকে কেন আক্রমণ করেছিস?

জবাবে বলল : স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের জন্যে।

আমি বললাম, আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আলহামদুলিল্লাহ। নতুবা তোমার ইচ্ছা।

জ্বীন বলল : তুমি নিজেকে কষ্টে ফেল না।

আমি এ নারী থেকে বের হব না। এর পূর্বেও ওর স্বামী অনেকের নিকট চিকিৎসার জন্যে গমন করেছে, কোন কাজ হয়নি।

আমি জ্বীনকে বললাম আমি তোমাকে মহিলা থেকে বের হতে বলছি না।

জ্বীন বলল : তবে তুমি কি চাও আমার নিকট? আমি বললাম যে, আমি চাই তোমার নিকট ইসলাম উপস্থাপন করতে। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আলহামদুলিল্লাহ্ না হয় ইসলাম গ্রহণে কোন জোর জবরদস্তি নেই। দীর্ঘ সময় কথা বলাবলির পর সে ইসলাম গ্রহণ করল।

আলহামদুলিল্লাহ সেই জ্বিন মুসলমান হয়ে গেল। আমি জ্বীনকে বললাম যে, তুমি কি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছ না কি তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ?

জবাবে জ্বীন বলল : তুমি আমাকে জবরদস্তি করতে পার না। আমি বাস্তবেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে নারী থেকে বের হয়ে যেতে তোমার আর কি বাঁধা? সে বলল যে, এ সময় খ্রিষ্টান জ্বীনের এক দল আমার সামনে রয়েছে আর আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হয়ত মেরে ফেলবে। তারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি বললাম তোমাকে তাদের থেকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যদি তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি সত্যিই মুসলমান হয়েছ। তবে আমি তোমাকে এক এমন শক্তিশালী অস্ত্র দিব যে, তাদের কেউ তোমার নিকটেই আসতে পারবে না।

জ্বীন বলল : তবে এখনই দিন।

আমি বললাম : হ্যাঁ দিব। তবে আমারও কথা আছে যে, তুমি যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে থাক তবে তোমার তাওবা কেবল তখনই গ্রহণীয় হবে যখন তুমি এ নারীকে ছেড়ে যাবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে।

জ্বীন বলল : হ্যাঁ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; কিন্তু যাদুকরদের থেকে আমি কিভাবে নাজাত পাব। অত:পর আমি বললাম এটা সহজ বিষয়; কিন্তু তোমাকে আমার কথা পালন করতে হবে।

জ্বীন বলল : ঠিক আছে। আমি বললাম তুমি আমাকে বল, যাদু করে কোথায় রাখা হয়েছে। জ্বীন জবাব দিল : যে ঘরে নারীটি বাস করে সেই ঘরের আঙ্গীনায় কিন্তু আমি নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করতে পারব না, কেননা সেখানে এক জ্বীনকে যাদুর সংরক্ষণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যখনই সেই স্থান কেউ জানতে পারে তখন সে জ্বীন যাদুকে স্থানান্তরিত করে। আমি বললাম তোমার এ যাদুকরের সাথে কত কাল থেকে সম্পর্ক?

আমার সঠিক স্মরণ নেই জ্বীন কি জবাব দিয়েছিল তবে এতটুকু স্মরণ আছে যে, সে দশ অথবা বিশ বছর বলেছিল। আরও সে বলেছিল যে, সে এর পূর্বেও তিনটি নারীকে আক্রমণ করেছে। আর সে তিন নারী প্রসঙ্গে ঘটনা খুলে বলেছে। যখন তার কথায় আমি বিশ্বস্ত হলাম তখন আমি বললাম। এবার আমি তোমাকে যে অস্ত্র দেয়ার ওয়াদা করেছিলাম তা তুমি নিয়ে নাও।

জ্বীন বলল সেটা কি? তখন আমি জবাব দিলাম যে, তা হলো আয়াতুল কুরসি। যখনই তোমার নিকট কোন জ্বীন আসতে চাইবে তোমাকে আঘাত করার জন্যে তুমি সে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে; তাহলে সেই জ্বীন পালিয়ে যাবে। আমি জ্বীনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি আয়াতুল কুরসি মুখস্ত আছে?

জবাবে বলল : হ্যাঁ কেননা এ নারী আয়াতুল কুরসি অধিক পরিমাণে পড়ত তাই শুনতে শুনতে মুখস্ত হয়ে গেছে। সে বলল : আমি যাদুকর থেকে কিভাবে নাজাত পাব? আমি বললাম, তুমি এ নারী থেকে বের হয়ে মক্কায় চলে যাও এবং সেখানে মুসলমান জ্বীনদের মাঝে বসবাস কর।

জ্বীন বলল : আমাকে কি আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করে দিবেন? কেননা আমি এই নারীর প্রতি অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছি এবং আরও তিন মহিলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

আমি বললাম : তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই মাফ করবেন। সূরা যুমারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা (পাপ করে) নিজের ওপর অন্যায় করেছে, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইও না, কেননা আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

(সূরা যুমার : আয়াত-৫৩)

অত:পর সে কেঁদে ফেলল এবং বলল যখন আমি এ নারীকে ছেড়ে চলে যাব তখন আমার পক্ষ থেকে এ নারীর নিকট আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার আবদার করবেন। কেননা আমি তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে ওয়াদা করল এবং নারীর ভিতর থেকে বের হয়ে গেল।

এরপর আমি কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে বললাম যে, এই পানি আঙ্গীনায় ছিটিয়ে দিবেন। এরপর কিছু দিন পর সে ব্যক্তি আমাকে জানাল যে, তার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। (এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ)

দ্বিতীয় উদাহরণ : জ্বীনের যাদুর পুটলি বালিশের নিচে রাখা

এক নারীর স্বামী আমার নিকট এসে বলল : যখন আমি এ নারীকে বিয়ে করলাম তখন থেকেই আমাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি সে আমাকে খুবই ঘৃণা করতো। আমার একটি কথাও শুনতে প্রস্তুত নয় সে। তার একটিই চাওয়া-পাওয়া যে, সে যেন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আশ্চর্য বিষয় হল যে আমি যে বাড়ির বাইরে থাকলে সে অনেক খুশীতে থাকে। আর যখনই আমি বাড়িতে প্রবেশ করি, আর সে আমার চেহারা দেখে তখনই সে রাগে ফেটে পড়ে। ফলে আমি কুরআনের আয়াত নারীর সামনে তেলাওয়াত করি এরপর সে নিস্তব্ধ হতে লাগল এবং তার মাথা ব্যথা আরম্ভ হলো কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে অজ্ঞান হয়নি।

অত:পর আমি কুরআনের এক ক্যাসেট রেকর্ড করে তাকে দিলাম এবং বললাম যে, এই সূরা পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত শ্রবণ করে এরপর আমার আসবে। সেই

ব্যক্তি বলল যে, পঁয়তাল্লিশ দিন পর যখন তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমার কাছে আসতে চাইল তখন তার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেল এবং তার কণ্ঠে জ্বীন বলতে লাগল : আমি তোমাকে সব কিছু বলব কিন্তু শর্ত হলো যে, তুমি আমাকে সেই আলেমের কাছে নিয়ে যাবে না। সে বলল, আমাকে যাদুর মাধ্যমে এ নারীর নিকট পাঠানো হয়েছে। যদি তুমি আমার সত্যতা যাচাই করতে চাও তাহলে শয়নকক্ষে বালিশের দিকে ইশারা করে বলল, সেটা আমার কাছে নিয়ে আস।

আমি সেই বালিশ উঠিয়ে নিয়ে আসলাম এবং সে বালিশটি খুলতে বলল। যখন আমি বালিশটি খুললাম তখন আমি দেখতে পাই যে তাতে কাগজের কিছু টুকরা যাতে কিছু লেখা রয়েছে। অত:পর জ্বীন বলল যে, এই কাগজগুলো জ্বালিয়ে দাও আমি আর কখনও আসব না; কিন্তু একটি শর্ত হলো, আমি এ নারীর সামনে প্রকাশ লাভ করে তার সাথে মুসাফাহা করব। তখন সেই ব্যক্তি বলল অসুবিধা নেই।

এরপর তার স্ত্রী অজ্ঞান থেকে জ্ঞান ফিরলে তার হাত সামনে বৃদ্ধি করে দিল যেন সে কারো সাথে মোসাফাহ করছে। আমি এ কাহিনী শ্রবণের পর বললাম, তুমি এক বড় ভুল করেছ। তোমার স্ত্রীকে ওর সাথে মোসাফাহার জন্যে অনুমতি দিয়েছ; যা অবৈধ এবং হারাম। কেননা নবী করীম ﷺ নারীদেরকে পর পুরুষের সাথে মোসাফাহা করা নিষেধ করেছেন।

অত:পর এক সপ্তাহ পর সে নারী পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। আর সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার নিকট নিয়ে আসল। যখনই আমি আউযুবিল্লাহ পড়লাম মহিলাটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল তারপর (তার প্রতি আসর কথা) জ্বীনের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। আমি বললাম, হে মিথ্যাবাদী! তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আর দ্বিতীয়বার আসবে না; এরপরও কেন আসলে? জ্বীন বলল, আমি সব কিছুই বলব আপনি আমাকে প্রহার করবেন না। আমি বললাম, ঠিক আছে বল। জ্বীন বলতে লাগল, আমি তাকে মিথ্যা বলেছিলাম যাতে তার বিশ্বাস হয়। আমি বললাম, তুমি নারীর সাথে প্রতারণা করেছ। জ্বীন বলল, শেষ পর্যন্ত আমি কি করতে পারি। যাদুর দ্বারা আমাকে এই মহিলার ভিতরে বন্দি করে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মুসলমান?

সেই জবাব দিল যে, "হ্যা"। মুসলমানের জন্যে না জায়েয, যাদুকরের স্বার্থে কাজ করা বরং এটা হারাম, মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ। তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও না? জ্বীন বলল, হ্যাঁ আমি জান্নাতে যেতে চাই, আমি বললাম, তাই যদি চাও তাহলে যাদুকরকে ছেড়ে এবং মুসলমানদের সাথে একীভূত হয়ে আল্লাহর

ইবাদত কর। কেননা যাদুর কাজ দুনিয়ার জন্যও অমঙ্গল আর আখেরাতে এর পরিণতি জাহান্নাম। জ্বীন বলল : আমি কি করে ছাড়তে পারব অথচ যাদুকরের জাল থেকে বের হয়ে আসার সামর্থ্য আমার নেই।

আমি বললাম, এ সবের কারণ তোমার পাপ। আর যদি তুমি নিষ্ঠার সাথে তাওবা কর তবে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا.

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে মু'মিনদের ওপর কোন সামর্থ্য রাখেননি। (সূরা নিসা : আয়াত-১৪১)

জ্বীন বলল : আমি তাওবা করছি এবং এ নারী থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এবং আর কোন সময় ফিরে আসব না। এরপর সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বের হয়ে গেল আর ফিরে আসেনি।

যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আর তাকে ব্যতীত কেউ কারো মঙ্গল ও অমঙ্গল করতে পারে না। নারীর স্বামী অনেক দিন পর আমার নিকট এসে বলল যে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ।

তৃতীয় উদাহরণ :সর্বশেষ কাহিনী যা এ গ্রন্থটি লেখার পূর্বে আমার সাথে ঘটেছে

এক নারীর স্বামী আমার নিকট এসে বলল যে, তার স্ত্রী তাকে ঘৃণার সৃষ্টিতে দেখে এবং তার সাথে থাকতে চায় না অথচ সে তাকে অনেক পছন্দ করে। আর বিষয়টি হঠাৎ করেই হয়েছে। আমি সে নারীকে কুরআনের কিছু আয়াত শুনালাম যার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আর সাথে সাথে আলোপ-আলোচনা আরম্ভ শুরু হলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মুসলমান?

জ্বীন জবাব দিল : হ্যাঁ আমি মুসলমান।

আমি বললাম : তাহলে তুমি এ নারীকে ধরেছ কেন?

জ্বীন জবাব দিল যে, আমাকে যাদুর মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়েছে। অমুক মহিলা এই মহিলাকে যাদু করেছে। আর যাদু করে এক আতরের শিশিতে রেখে দিয়েছিল যা এ মহিলার কাছে রয়েছে। আমি এ নারীর পিছে লেগেছিলাম অনেক দিন থেকে। এরই মধ্যে তার ঘরে এক চোর আসল আর সে ভীত হয়ে গেল। অত:পর আমি তাকে আয়ত্বে নিয়ে নিলাম। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করছি,

যাদুকর জ্বীন পাঠিয়ে সেই ব্যক্তির কাছে যাকে যাদু করতে চায়। জ্বীন সেই ব্যক্তির পিছু করতে থাকে, আর যখন সে সুযোগ পেয়ে যায় সে ব্যক্তির ভিতরে প্রবেশ করে। চারটি এমন সুযোগ যে সুযাগে জ্বীন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ১. খুব বেশি ভীত হলে। ২. অতিমাত্রায় রাগান্বিত হলে। ৩. অতিমাত্রায় উদাসীন অবস্থায়। ৪. মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়।

মানুষ যদি এ চার অবস্থার একটিতে থাকে শয়তান তার ভেতর প্রবেশ করে। হ্যাঁ তবে যদি সে তখন ওযূ অবস্থায় থাকে বা দু'আ যিকির করে থাকে কোন জ্বীন তার ভেতরে যেতে পারে না। (বলা হয় যেমন অনেক জ্বীন আমাকে বলেছে তা সত্যও হতে পারে।) যদি জ্বীন প্রবেশ করার সময় আল্লাহ্ তা'আলার জিকির (দু'আ পড়া) সেই ব্যক্তি করে তবে জ্বীন জ্বলে যায়। এজন্য জ্বীনের প্রবেশকালীন সময়টি খুব কঠিন মুহুর্ত এ জ্বীনের সমস্ত জীবনের মধ্যে।

জ্বীন বলল যে, এ নারী খুবই উত্তম। আমি বললাম যে, তুমি এ নারীকে ছেড়ে চলে যাও। জ্বীন বলল, শর্ত হলো যে, তার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিলে আমি চলে যাব। আমি বললাম, তোমার শর্ত গ্রহণীয় নয়। তুমি এখনি এ নারী থেকে বের হয়ে যাও নতুবা আমি তোমাকে শায়েস্তা করব। জ্বীন বলল : ঠিক আছে আমি এখন বের হয়ে যাব।

আলহামদুলিল্লাহ্ জ্বীন বের হয়ে চলে গেল। এরপর আমি তার স্বামীকে বললাম যে, তোমার স্ত্রীকে কেউ যাদু করেনি। জ্বীন অধিক পরিমাণে মিথ্যা বলে থাকে যাতে মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই তুমি আল্লাহকে ভয় কর আর জ্বীনের কথা বিশ্বাস করো না।

চতুর্থ উদাহরণ : আলেমের ভিতরে জ্বীনের প্রবেশের ইচ্ছা

আমার নিকট এক নারীর স্বামী এসে বলতে লাগল যে, তার স্ত্রী তাকে একেবারেই দেখতে পারে না। আমি তার থেকে দূরে থাকলে খুব খুশি। যখন আমি বাড়িতে আসি তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। কাজেই যখন আমি মহিলাকে কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তাতে বুঝতে পারলাম যে, তাকে বিচ্ছেদের যাদু করা হয়েছে। অত:পর যখন তার ওপর শরয়ী ঝাড়ফুঁক করলাম তখন জ্বীন কথা বলতে আরম্ভ করল :

জ্বীনের সাথে আমার কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো :

আমি বললাম : তোমার নাম কি?

জ্বীন : আমি বলব না।

আমি বললাম : তোমার ধর্ম কি?

জ্বীন : ইসলাম।

আমি বললাম : মুসলমানদের জন্য কি জায়েয মুসলিম নারীকে কষ্ট দেয়া?

জ্বীন : আমার সাথে তার ভালোবাসা হয়ে গেছে, আমি তাকে কষ্ট দেই না; কিন্তু আমি চাই যে, তার নিকট থেকে তার স্বামী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক।

আমি বললাম : তুমি কি স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ চাও?

জ্বীন : হ্যাঁ।

আমি বললাম : তোমার জন্য এটা হারাম, আল্লাহর নির্দেশ মেনে বের হয়ে যাও।

জ্বীন : না- না, আমি ওকে পছন্দ করি।

আমি বললাম : কিন্তু সে তো ঘৃণা করে।

জ্বীন : না, এও আমাকে পছন্দ করে।

আমি বললাম : তুমি মিথ্যাবাদী। সত্য হলো যে, সে তোমাকে ঘৃণা করে যার কারণে এ নারী এখানে এসেছে যাতে তোমাকে তার শরীর থেকে বের করতে পারে।

জ্বীন : আমি কখনো যাব না।

আমি বললাম : আমি কুরআন পড়ে আল্লাহর সাহায্য ও শক্তিতে তোমাকে জ্বালিয়ে দিব।

এরপর আমি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত আরম্ভ করলাম যার ফলে জ্বীন চিল্লাতে লাগল।

আমি বললাম : এখন বের হবি কিনা?

জ্বীন : হ্যাঁ" কিন্তু এক শর্তে–

আমি বললাম : কি সেই শর্ত?

জ্বীন : আমি এ নারী থেকে বের হয়ে তোমার ভেতরে প্রবেশ করব। আমি বললাম : তাতে কোন সমস্যা নেই যদি তুমি আমার মধ্যে প্রবেশ করতে পার কর। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর সে কান্নাকাটি করতে লাগল।

আমি বললাম : কিসে তোকে কাঁদাল?

জ্বীন : কোন জ্বীন আজ তোমার ভেতর প্রবেশ করতে পারবে না।

আমি বললাম : কেন? এর কি কারণ?

জ্বীন : এজন্য যে, আজ তুমি সকালে (لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْـدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَـهٗ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَـهُ الْحَـمْدُ وَهُـوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَـدِيْرٌ) একশবার পড়েছ।

আমি ভাবলাম : নবী করীম ﷺ সত্যই বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَاشَرِيْـكَ لَهٗ، لَـهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْحَـمْـدُ وَهُـوَ عَـلٰى كُـلِّ شَىْءٍ قَـدِيْـرٌ.

১০০ বার পাঠ করবে সে যে দশটি দাস মুক্ত করল, আর তার আমলনামায় একশ সওয়াব লেখা হবে, আর তার থেকে একশত পাপ ক্ষমা করা হবে, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে। তার অপেক্ষা কেউ এমন ফযীলত পাবে না, তবে যে তার অপেক্ষা অধিক আমল করবে। এরপর আমি তাকে বললাম : অতএব তুমি এ মুহূর্তে এ মহিলাকে ছেড়ে চলে যাও। সব একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আলহামদুলিল্লাহ সে এমনটিই করল এবং বের হয়ে গেল।

৮. আসক্ত করার যাদু

রাসূল ﷺ বলেন : "অবৈধ ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজ ও 'তওয়ালা' (আসক্ত করা যাদু) নিশ্চয়ই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" (মুসনাদে আহমদ : ১/৩৮১, আবূ দাউদ : ৩৮৮৩ ইত্যাদি আলবানী (রহ) সহীহ বলেছেন)

আল্লামা ইবনে আছীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'তেওয়ালা' অর্থ হলো এমন পন্থা অবলম্বন করা যার ফলে স্ত্রী-স্বামীর নিকট যাদু বা অন্য কিছুর মাধ্যমে প্রিয় হয়ে যায়। যা নবী রাসূল ﷺ শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তাদের বিশ্বাস হয় যে, এসব কিছু আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ব্যতীতই এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমনটি হয়ে গেল। (আন-নিহায়া : ১/২০০)

আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে, হাদীসে যে বিষয়ের ঝাড়-ফুঁকের নিষেধ এসেছে তা সেই সব ঝাড়-ফুঁক যার দ্বারা জ্বীন শয়তান ও অন্য কিছুর সাহায্য নেয়া হয়ও যার মধ্যে অংশীদার আছে। তবে যেই ঝাড়-ফুঁক কুরআন আর হাদীস থেকে হবে তা জায়েয তাতে কোন মতবিরোধ নেই। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, ঝাড়-ফুঁকে কোন সমস্যা নেই যদি তাতে কোন শিরক না থাকে।

আসক্তকারী যাদুর লক্ষণসমূহ

১. অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে যাওয়া ও ভালোবাসা।
২. সর্বদায় সহবাস করতে চাওয়া।
৩. সহবাসের জন্য অধৈর্য হয়ে যাওয়া।
৪. স্ত্রীকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে যাওয়া।
৫. স্ত্রীর বশে ও তাবে' হয়ে যাওয়া।

আসক্তকারী যাদু যেভাবে সংঘটিত হয়

সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েই থাকে আবার তা স্বাভাবিক হয়ে যায়; কিন্তু কিছু সংখ্যক নারী অধৈর্য হয়ে যাদুকরের কাছে ছুটে যায় যাতে যাদুর মাধ্যমে ভালোবাসা অধিক মাত্রায় আদায় করতে পারে। এর কারণ নারীর নিকট তার স্বামীর কোন পোশাক যেমন : রুমাল, টুপি, জামা, গেঞ্জি ইত্যাদি চায় যাতে তার ঘামের গন্ধ থাকে যা নতুন অথবা ধোয়া নয়, বরং ব্যবহৃত। যাদুকর তা থেকে সূতা নেয় আর তাতে গিরা লাগিয়ে কিছু পড়ে ফুঁ দেয়। এরপর সে নারীকে বলে, এ সূতাগুলো নির্জন স্থানে পুঁতে রাখার জন্যে অথবা খাদ্যদ্রব্যে অথবা পানিতে যাদুর ফুঁ দিয়ে দেয়। এ যাদুর নিকৃষ্ট পদ্ধতি হলো, অপবিত্র জিনিস দ্বারা যাদু করা। যেমন : হায়েযের রক্ত দিয়ে যাদু করা। অত:পর সেই নারীকে বলা হয়, তা তার স্বামীকে খাইয়ের দিবে বা তার আতর সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে দেবে।

আসক্তকারী যাদুর বিপরীত প্রভাব

১. কখনো যাদুর দ্বারা স্বামী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে তিন বছর এ জাতীয় যাদুর প্রভাবে রোগাক্রান্ত ছিল।
২. কখনো আবার ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা সৃষ্টি হতে থাকে। আর এটা এজন্য যে, কিছু যাদুকর যাদুর মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান রাখে না।
৩. কখনো স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এমন যাদু করে বসে যে, তার স্বামী যেন সব নারীকে ঘৃণা করে কেবল তাকেই পছন্দ করে। যার ফলে সেই ব্যক্তি নিজের মা-বোন এবং তার আত্মীয় মহিলাদের ঘৃণা করতে থাকে।
৪. কখনও তার দ্বিমুখী যাদুর ক্রিয়া উল্টে গিয়ে স্বামী সকল মহিলাকে ঘৃণার সাথে স্ত্রীকেও ঘৃণা করা আরম্ভ করে। এমন খবরও পেয়েছি যে, স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা করে তালাক দিয়ে দেয়। আর স্ত্রী দ্বিতীয়বার দৌড়ে যাদুকরের কাছে যায় যাতে যাদুর প্রভাব নষ্ট করে দেয়; কিন্তু ঘটনাক্রমে যাদুকর তার পৌঁছার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে ।

আসক্তকারী যাদু করার কারণসমূহ

১. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে মতভেদ।

২. স্বামীর ধনের প্রতি স্ত্রীর লোভ, বিশেষ করে যদি স্বামী ধনী হয়ে থাকে।

৩. স্ত্রীর ধারণা যে, স্বামী হয়ত অন্যত্র বিবাহ্ করবে, অথচ শরীয়তে তা জায়েয, তাতে কোন দোষ নেই; কিন্তু বর্তমান যুগের নারী বিশেষ করে ধ্বংসাত্মক মিডিয়া প্রভাবিত নারী ধারণা করে থাকে যে, তাদের স্বামী অন্য বিবাহ্ করার অর্থ হলো সে তাকে পছন্দ করে না। এটি একটি মারাত্মক ভুল। কেননা এমন অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে পুরুষ এক, দুই, তিন ও চার পর্যন্ত বিবাহ্ করে। অথচ দেখা যায় সে তার প্রথম স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসে। যেমন : কেউ বেশি সন্তান লাভের জন্য বা কেউ স্ত্রীর ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবের সময় সহ্বাস না করে ধৈর্য ধরতে পারে না বা কেউ কোন বিশেষ পরিবারের সাথে সম্পর্ক গড়তে চায় বা আরো অধিক কারণ থাকতে পারে।

স্বামীকে আসক্ত করার হালাল যাদু

এটা এমন এক বিষয় যা আমি ফরজ মনে করি মুসলিম নারীদের জানানো। কথা হলো যে, প্রত্যেক নারী তার স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে জায়েয যাদু বা পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

যেমন নারী তার স্বামীর জন্যে নিজেকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করে রাখবে, স্বামীর সাথে মিষ্টি কথা বলবে, অনুরূপ ফুটন্ত মুচকি হাসি উত্তম ব্যবহার করবে। যতে তার স্বামী এদিক-সেদিক দৃষ্টি না দেয়; বরং নিজের স্ত্রীর দ্বারাই প্রভাবিত থাকে। এছাড়া স্বামীর সম্পদের সংরক্ষণ করবে, তার সন্তানদের যত্ন নিবে। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত স্বামীকে মান্য করে চলবে; কিন্তু আজকের বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দিলে সম্পূর্ণই এর বিপরীত দেখতে পাওয়া যায়।

কোন নারী কোন অনুষ্ঠানে গেলে অথবা নিজের বান্ধবীদের সাক্ষাতে গেলে এমনভাবে সাজ-গোছ করে ও গয়না পরে, যেন সে বাসর রাতের বধূ অত:পর যখন সে সেখান হতে ফিরে আসে সম্পূর্ণরূপে তা খুলে স্বীয় স্থানে রেখে পরবর্তী অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকে অথচ তার স্বামী বেচারা যে তার জন্য এসব পোশাক ও গয়না কিনেছে সে বঞ্চিতই থেকে যায় তা উপভোগ করা হতে। সে তাকে গৃহে সেই পুরাতন পোশাকেই পায়, যা হতে পিয়াঁজ ও রসুন ও পাকের দুর্গন্ধই

বের হয়। নারী যদি জ্ঞান করে তবে সে অবশ্যই বুঝবে যে, নিশ্চয়ই তার স্বামীই তার সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য উপভোগের অগ্রাধিকারী। কাজেই তোমার স্বামী যখন কাজের জন্য বেরিয়ে যায়, তখন দ্রুত তুমি ঘরের কাজ-কর্ম সেরে গোসল করে, সৌন্দর্য ও সুসজ্জিত হয়ে তাঁর অপেক্ষায় থাক।

স্বামী কর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে মুচকি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাও। সে যখন ঘরে ফিরে তার সুন্দরী স্ত্রীকে সামনে পাবে, পানাহারও প্রস্তুত, ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তবে অবশ্যই তার ভালোবাসা তোমার প্রতি অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আল্লাহর কসম! এটিই তোমার জন্য বৈধ যাদু হিসেবে পাবে। বিশেষ করে তুমি যদি তোমার সৌন্দর্য গ্রহণের নিয়ত কর আল্লাহর আদেশের অনুসরণ তারপর স্বামীর দৃষ্টিশক্তি অবনমিত করা। কেননা পরিতৃপ্ত কখনও খাবারের আগ্রহ রাখে না; বরং যে তা হতে বঞ্চিত সেই আগ্রহ রাখে। এ মূল্যবান কথাটির প্রতি একটু দৃষ্টি দিবে।

আসক্তকারী যাদুর চিকিৎসা

১. রোগীর জন্যে সে সব আয়াত পাঠ করতে হবে যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তার মধ্যে সূরা বাকারার ১০২ নং পড়ে বরং সূরা তাগাবুন-এর ১৪. ১৫ ও ১৬ নং আয়াত পড়বে ।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে কতক তোমাদের শত্রু। অতএব এদের থেকে সাবধান থাক। আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও করুণাময়। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদসমূহ ও সন্তানাদি পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে সওয়াব রয়েছে। কাজেই আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং তার কথা শ্রবণ কর

এবং পালন কর। আর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর। আর যারা নিজেকে কৃপণতা থেকে রক্ষা করল তারাই সফলকাম। (সূরা সোয়াদ : ১০৮, ১১৬) পড়তে হবে।

২. এক্ষেত্রে রোগী সাধারণত: অজ্ঞান হবে না তবে পার্শ্বদেশ অবশ হয়ে আসবে। মাথা ব্যথা ও বুক ধড়ফড় অনুভব করবে অথবা সে বারবার বমি করবে অথবা পেটে চরম ব্যথা করবে যদি বিশেষ করে যাদু পান করানো হয়। সুতরাং সে যদি পেটে ব্যাথা অনুভব করে অথবা বমি করতে চায় তবে নিম্নের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিবে আর সেই পানি নিজের সামনেই রোগীকে পান করাবে। যদি পানি পান করার পর রোগীর কালো অথবা লাল বমি হয় তবে বুঝতে হবে যে, যাদু শেষ হয়ে গেছে। আর না হয় এ পানি তিন সপ্তাহ অথবা এর বেশি পান করতে বলা হবে। যাতে যাদু শেষ হয়ে যায়। সে আয়াত হলো এই–

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ، وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

“অত:পর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা (আ.) বললেন : যাদু এটাই; নিশ্চয় আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন না। আর আল্লাহ নিজ ওয়াদা অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারিতা তা অপ্রীতিকর মনে করে।”

(সূরা ইউনুস : আয়াত-৮১-৮২)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ، وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

২. “তখন আমি মূসা-এর নিকট এ ওহী প্রেরণ করলাম : তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আ.) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বড় সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা

সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু তৈরি করা হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার দলবলের হয়ে গেল। যাদুকরগণ তখন সিজদায় লুটে পড়ল। তারা পরিষ্কার ভাষায় বলল : আমরা বিশ্ব পালনকর্তার প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো- কোন বিশ্ব পালনকর্তার প্রতি? জবাবে তারা বলল, মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি।"

(সূরা আরাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সবার রক্ষণা-বেক্ষণাকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই, এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি জানেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না; তাঁর কুরসী নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৫)

আয়াতে কারীমাগুলো পানির উপর তিলাওয়াত করুন তবে স্ত্রীর অগোচরে পড়তে হবে। কেননা সে জানতে পারলে পুনরায় সে যাদুর আশ্রয় নিবে।

আসক্তকারী যাদুর এক উদাহরণ

একই ব্যক্তি আমার কাছে বলতে লাগল, প্রথম অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতাম। এখন জানি না কি হয়ে গেল স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে পারি না। কাজের সময়ও তারই ধ্যান চলে আসে। কাজ শেষ হলে দ্রুত স্ত্রীর কাছে পৌছার জন্যে ততপর থাকি। যদি মেহমানদের মাঝে বসে থাকি তবুও বার বার তাদেরকে রেখে স্ত্রীর কাছে চলে যাই। সব সময় আমি তার পিছনেই থাকি। বুঝে আসছে না আমার কি হয়ে গেল। তাকে ছাড়া আমি আর টিকতে

পারছি না। সেই যেন আমাকে এখন পরিচালনা করছে। সে যদি রান্না ঘরে যায় আমি তার পিছে, সে যদি শয়ন কক্ষে যায় আমি তার পিছে পিছে, আমি তার পিছে পিছে সে যখন ঝাড়ু দেয়। জানি না আমার কি হয়ে গেছে। সে যখন কোন কিছুর আবেদন করে সাথে সাথেই তা আমি পূরণ করে দেই।

এসব কথা শোনার পর আমি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে দিলাম আর তাকে দিয়ে বললাম, তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পানি পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। আর তিন সপ্তাহ পর আমার নিকট আসতে বললাম এবং সাবধান করলাম যে, তার স্ত্রী যেন জানতে না পারে। সে এমনটিই করল এবং সে বল যে, সে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে তবে কিছু লক্ষণ এখনো আছে। আমি তার জন্য দ্বিতীয়বার সেই চিকিৎসাই করলাম। আলহামদুলিল্লাহ এসব আল্লাহ তা'আলার কারণ। আমার এর মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নেই।

৯. নরজবন্দী বা ভেল্কিবাজির যাদু

সূরা আরাফে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

قَالُوْا يَا مُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ، قَالَ اَلْقُوْا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ، وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ، وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

অর্থাৎ যাদুকররা বলল, হে মূসা! আপনি (প্রথম) নিক্ষেপ করবেন না হয় আমরা নিক্ষেপ করব। মূসা (আ.) বললেন, নিক্ষেপ কর। এরপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন জনগণের দৃষ্টিকে যাদু করল এবং তাদেরকে ভীত করে তুলল। আর আমি মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলাম যে আপনি আপনার লাঠিটি নিক্ষেপ করুন। অত:পর মুহূর্তেই সেই লাঠি (সাপে পরিণত হয়ে) তাদের যাদু বস্তুগুলো গিলে ফেলল। অত:পর সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো আর তাদের কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে গেল। সেখানেই তারা পরাজিত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হলো। আর যাদুকর সকলেই

সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল আমরা বিশ্ব পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থান করেছি মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতিও ঈমান এনেছি।

(সূরা আরাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

আর সূরা ত্বা-হায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قَالُوْا يَا مُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى، قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى -

সেই যাদুকরগণ বলল, হে মূসা! আপনি প্রথম নিক্ষেপ করবেন না কি আমরা প্রথম নিক্ষেপ করব। মূসা (আ.) বললেন বরং তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। অত:পর মুহূর্তেই তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর দ্বারা মূসা (আ.)-এর নিকট মনে হয় সে ওগুলো দৌড়াচ্ছে। (সূরা-ত্বাহা : আয়াত-৬৫৬৬)

ভেল্কিবাজি যাদুর লক্ষণসমূহ

১. মানুষ কোন স্থিতিশীলবস্তুকে চলতে দেখতে পায়, আবার চলমানকে অচল জড় পদার্থের মতো দেখতে পায়।
২. বড় ধরনের বস্তুকে ছোট আর ছোটকে বড় দেখতে পায়।
৩. একটি বস্তু অন্য কোন বস্তুতে রূপান্তরিত দেখা। যেমন : মূসা (আ)-এর সময়কালের যাদুর দ্বারা রশি আর লাঠিকে অজগর সাপের রূপে দেখতে পেয়েছিল।

যেভাবে এ যাদু করা হয়

যাদুকর সাধারণ বা সবার নিকট পরিচিত কোন বস্তু সামনে নিয়ে আসে। অত:পর নিজে শিরকযুক্ত মন্ত্র পাঠ করে শয়তানের কাছে প্রার্থনা করে। অত:পর শয়তানের সাহায্যে সেই বস্তুটি অন্য কোন রূপ দিয়ে দেখানো হয়। এমনি এক কাহিনী এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছে, এক যাদুকর লোকজনের সামনে ডিম রেখে খুব দ্রুত ঘুরায়। অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করল যে, যাদুকর দু'পাথরকে পরস্পর আঘাত করে দেখতে দেখা যায় দুই ছাগল লড়ে। এসবের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আশ্চর্য করে তাদের থেকে অর্থ লুটিয়ে নেয়া।

কখনও আবার যাদুকর এ জাতীয় যাদুকে অন্য ধরনের যাদুর জন্যে কাজে লাগায়। যেমন : স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের যাদু দ্বারা সুন্দরী স্ত্রীকে কুৎসিত রূপে দেখতে

পায় তার স্বামী। আর আসক্তকারী যাদুতে কুৎসিত স্ত্রী সুন্দরীরূপে দেখতে পায় তার স্বামী। আর এ জাতীয় যাদু অন্য প্রকারগুলো থেকে আলাদা যাকে ভেল্কিবাজি বলা হয়। আর সাধারণত তা হাতের ম্যার-প্যাচের ওপর নির্ভর করে।

ভেল্কিবাজির যাদুকে নষ্ট করার নিয়ম

এ যাদুকে এমন নেক কাজ দ্বারা ভঙ্গ করা যায়, যার দ্বারা শয়তানকে তাড়ানো হয়। যেমন : ১. আযান ২. আয়াতুল কুরসী, ৩. শয়তান বিতাড়িতকারী দু'আ-দরূদ ও ৪. বিসমিল্লাহ্ বলা। তবে এসব কিছু ওযূ অবস্থায় করতে হবে।

ভেল্কিবাজি যাদুর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থা নেয়ার পরও যদি তা নষ্ট না হয়, তবে বুঝতে হবে ভেল্কিবাজ তার হাতের কারসাজিকেই কাজে লাগিয়েছে, সে আসলে যাদুকর নয়।

ভেল্কিবাজি যাদুর একটি বাস্তব উদাহরণ ও তার প্রতিকার

এক যাদুকরের কুরআনকে ঘুরানো

মিশরের এক যাদুকর লোকজনের সামনে কুরআন ঘুরিয়ে তার তেলেসমাতি প্রকাশ করত। কুরআনে এক সূতা বেঁধে সেটাকে চাবির সাথে বেঁধে দিত এরপর কুরআন উপরে উঠিয়ে ঝুলিয়ে রেখে কিছু মন্ত্র পড়ে কুরআনকে বলত ডানে ঘুর আর কুরআন ডানে ভন ভন করে ঘুরত, বামে ঘুরতে বললে বামে ঘুরত। এভাবে মানুষ ফিতনায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

কেননা কুরআনের সাথে এ যাদু। আমি যাদুকরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললাম আমার সামনে যাদু দেখাতে পারবে না। জনগণ আমার কথা শ্রবণ করে আশ্চর্য হলো। আমার সাথে এক যুবক ছিল তাকে অন্য প্রান্তে বসতে বললাম। আমি আমার সাথীকে বললাম বার বার আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতে থাক। এবার সে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতে লাগল। আর আমিও অন্য প্রান্তে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতে লাগলাম। অন্যদিকে যাদুকর তার যাদুমন্ত্র শেষ করে কুরআনকে বলল যে, ডান দিকে ঘুর এবার আর ঘুরছে না। দ্বিতীয়বার সে তার যাদুমন্ত্র পড়ে বলল বামে ঘুর; কিন্তু তার যাদু বিফলে গেল। কুরআন নিজ স্থানে অবস্থান করছে।' এভাবে আল্লাহ তা'আলা যাদুকরকে জনগণের সামনে অপদস্ত করেছেন।

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ .

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই সাহায্য করে যে, আল্লাহ্র আনুগত্য করে।"

(সূরা হজ্জ : আয়াত-৪০)

১০. পাগল করা যাদু

খারেজা বিনতে সালাত তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার নিকট থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমন সময় তিনি দেখতে পান যে, এক পাগল শিকলে বাধা অবস্থায় রয়েছে। তার সাথের লোকজন বলল : আমরা সংবাদ পেয়েছি, আপনাদের সে মহান সাথী নাকি এক মহান কল্যাণসহ আবির্ভূত হয়েছেন। কাজেই আপনাদের নিকট এমন কিছু কি আছে যা দ্বারা এ পাগলকে চিকিৎসা করতে পারেন?

অত:পর আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়-ফুঁক করলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তারা আমাকে এর বিনিময়ে ১০০টি ছাগল দিল। আমি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে পূর্ণ কাহিনী খুলে বললাম। বললেন, তুমি কি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়েছিল? আমি বললাম : না। অত:পর নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্র শপথ! কত শত মানুষ ভ্রান্ত ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা আয় রোজগার করে খায়; আর তুমি তা সঠিক ঝাড়-ফুঁকে অর্জন করেছ।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সেই সাহাবী সূরা ফাতেহা পাঠ করে তিন দিন সকাল-সন্ধ্যায় ঝাড়-ফুঁক করেন। যখনই সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করতেন মুখের থুথু জমা করে রোগীর উপর নিক্ষেপ করতেন।

(আবু দাউদ : ত্বিব : ১৯, ইমাম নববী সহীহ বলেছেন এবং শায়খ আলবানী।)

পাগল করা যাদুর লক্ষণসমূহ

১. অস্থিরতা, দিশাহারা ও ভুল-ভ্রান্তি অধিক হওয়া।

২. আলাদা আলোচনা সামঞ্জস্যহীনতা।

৩. চোখের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া এবং অসুন্দর হওয়া।

৪. কোন এক স্থানে স্থির না থাকা।

৫. কোন এক কর্মে স্থির না থাকা।

৬. নিজে পরিপাটি থাকায় উদাসীনতা।

৭. আর যে সময় চূড়ান্তরূপ ধারণ করে সে রোগী অজানা পথে চলতে থাকে। আর কখনও কখনও নির্জন স্থানে শুয়ে যায়।

পাগল করা যাদু যেভাবে করা হয়

যে জ্বীনের ওপর এ যাদুর কাজ অর্পিত হয় (যাদুকরের নির্দেশ অনুযায়ী) সে জ্বিন রোগীর মস্তিস্কে অবস্থান করে তার স্মরণশক্তি ও চালিকা শক্তির ওপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করে ও আয়ত্ব করে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যার ফলে পাগলের অবস্থায় পতিত হয়।

পাগল করা যাদুর চিকিৎসা–

১. ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠ করতে হবে।

২. যখন রোগী অজ্ঞান হয়ে যাবে, তখন তার সাথে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. আর যদি রোগী অজ্ঞান না হয় তবে উল্লেখিত পন্থায় তিন বার অথবা এরও অধিক ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। এরপরও যদি অজ্ঞান না হয় তবে সে সব সূরাকে কোন ক্যাসেটে রেকর্ড করে তাকে প্রতিদিনই দুই অথবা তিনবার এক মাস পর্যন্ত শুনাতে হবে : ঝাড়-ফুঁকের আয়াতও সূরাগুলো হলো–

   সূরা বাকারা, হুদ, হিজর, সাফফাত, ক্বাফ, আর রহমান, মূলক, জ্বীন, আ'লা, যিলযাল, হুমাযা, কাফিরুন, ফালাক ও সূরা নাস। দেখা যাবে এসব সূরা শ্রবণের ফলে রোগীর বুকে ধড়ফড় আরম্ভ করবে এমনকি রোগী আয়াত শুনতে শুনতে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এরপর জ্বীন কথা বলতে থাকবে আর কখনও কষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে পনেরো দিনের অধিকও থাকতে পারে। অত:পর আস্তে আস্তে কমতে কমতে মাসের শেষে একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় রোগীকে আয়াতগুলো তার ওপর স্বাভাবিকতা আসার জন্য পাঠ করতে থাকবে।

৪. চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীকে ব্যাথা কমের কোন ঔষধ ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। কেননা এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫. চিকিৎসাকালীন সময়ে বিদ্যুতের ঝটকা দেয়া যেতে পারে। কেননা তাতে যেমন দ্রুত আরোগ্য লাভে সাহায্য করতে পারে তেমনি জ্বীনের জন্যও অধিক কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

৬. এমনও হতে পারে যে, আপনি এক মাসের সময় থেকে কম নির্ধারণ করতে পারেন। অথবা তিন মাস অথবা এর অধিকও হতে পারে।

৭. চিকিৎসার সময়কালে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগী যেন কোন সাগীরা ও কাবীরা পাপে লিপ্ত না হয়। যেমন : গান-শোনা, ধূমপান, অথবা সালাত আদায় না করা ইত্যাদি। আর যদি নারী হয় তবে বেপর্দা যাতে না থাকে।

৮. যদি রোগীর পেটে ব্যাথা হয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীকে যাদু করা বস্তু পান করানো হয়েছে অথবা খাওয়ানো হয়েছে। আপনি তখন উল্লেখিত আয়াত তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে সুস্থ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পান করাবেন, যাতে যাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। অথবা রোগী বমি করে দেয়।

পাগল করা যাদুর কতিপয় উদাহরণ

প্রথম উদাহরণ

কিছু সংখ্যক লোক এক ব্যক্তিকে শিকলে বেঁধে আমার নিকট নিয়ে আসল সে আমাকে দেখামাত্র যারা তাকে বন্দি করে নিয়ে আসছিল তাদেরকে এমন জোরে লাথি মারল যে, তারা অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। এরপর তাদের সবাই মিলে তাকে বশে এনে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর আমি কুরআন পাঠ করে ঝাড়তে লাগলাম এরই মধ্যে সে আমার চেহারায় থুথু দিতে লাগল। এরপর আমি কতক ক্যাসেট ৪৫ দিন পর্যন্ত শুনতে দিলাম আর ৪৫ দিন পর আমার নিকট আসতে বললাম। আর যখন তারা পুনরায় রোগীকে নিয়ে আসল তখন চেতনা ও অনুভূতি রোগীর মধ্যে ছিল। আর প্রথমবার সেই বেআদবী করেছিল তাতে সে লজ্জিত ছিল, কেননা সে তখন পাগল অবস্থায় ছিল। আর এখন সে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে তাকে আর কোন দুর্ঘটনা পরিলক্ষিত হতে হয়নি। অত:পর সে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ফেরত চলে গেল। আর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমাকে আল্লাহ তা'আলা সুস্থ করে দেয়ায় কোন দান খয়রাত দিতে হবে কি না? অথবা রোযা রাখা আবশ্যক কিনা? জবাবে আমি বললাম, তা তোমার জন্যে ওয়াজিব নয় তবে যদি তুমি সাদকা কর তবে তা ভালো।

দ্বিতীয় উদাহরণ

একদিন আমার নিকট এমন এক যুবক আসল সে যে পাগল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যখনই আমি কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলাম তখন বুঝা গেল যে, যাদুর দ্বারা তাকে পাগল করা হয়েছে, সে কয়েকদিন পর বিয়ে করতে যাচ্ছিল। অত:পর আমি আরও আয়াত পাঠ করে তাকে ঝাড়লাম এবং কুরআনের ক্যাসেট এক মাস পর্যন্ত শুনতে বললাম। আর এরপর আসতে বললাম। প্রায় বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার এক আত্মীয় সুসংবাদ দিল যে, সে পরিপূর্ণ সুস্থ এবং সে বিয়েও করেছে। আলহামদুলিল্লাহ এ সব আল্লাহ তা'আলার দয়া ও কৃপার ফল।

১১. একাকীত্ব ও নির্জনতা পছন্দের যাদু

এ যাদুতে নিম্নের লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. একাকীত্বকে পছন্দ করা।

২. সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকা।

৩. সর্বদায় নীরব থাকা।

৪. মানুষের সাথে সামাজিকতাকে ঘৃণা করা।

৫. সব সময় মাথা ব্যাথা।

যেভাবে এ ধরনের যাদু করা হয়ে থাকে–

যাদুকর জ্বীনকে সে ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিবে যাকে যাদু করতে চায়। আর জ্বীনকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন ব্যক্তিটির মস্তিষ্ককে নিজ আয়ত্বে নিয়ে আসে। আর এ যাদুর প্রভাব এতোই অধিক হয় জ্বীন ততো শক্তিশালী হয়।

এ ধরনের যাদুর চিকিৎসা

১. পূর্বের পদ্ধতিতে তাকে ঝাড়বে। আর যখন রোগী অজ্ঞান হয়ে যাবে তখন তাকে ভালো কাজের নির্দেশ আর অন্যান্য, অবিচার, পাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবে। যেমন : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আর যদি রোগী অজ্ঞান না হয় তবে কুরআনের ক্যাসেট তাকে শোনার জন্য দিবে যাতে থাকবে। ১. সূরা ফাতেহা, ২. সূরা বাকারা ৩. আলে-ইমরান ৪. সূরা ইয়াসীন, ৫. আসসাফফাত, ৬. আদ্দুখান, ৭. যারিয়াত, ৮. হাশর, ৯. মাআরেজ, ১০. গাশিয়া, ১১. যিলযাল, ১২. আলক্বারিয়া, ১৩. ফালাক ও ১৪. সূরা নাস।

৩. এ সমস্ত সূরা তিনটি ক্যাসেট রেকর্ড করবে আর রোগীকে বলবে, এক ক্যাসেট সকালে ও দ্বিতীয়টি বিকালে ও অন্যটি ঘুমানোর সময় শ্রবণ করবে। এভাবে ৪৫ দিন শুনবে বা মেয়াদ ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়তে পারে।

৪. নির্ধারিত সময় অতিক্রম করলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে আরোগ্য লাভ করবে। রোগী তার আরামের জন্যে কোন ঔষধ ব্যবহার করবে না।

৫. রোগী যদি পেটে ব্যাথা অনুভব করে তাহলে উল্লেখিত সূরাগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে উপরিউক্ত সময়সীমা পর্যন্ত পান করতে দিবে।

৬. আর যদি রোগীর সর্বদায় পেটে ব্যাথা থাকে তবে সেই পানির দ্বারা প্রতিদিন অন্তর অন্তর গোসল করবে তবে শর্ত হলো সে পানি বাড়াবে না বা গরমে করবে না এবং পরিষ্কার স্থানে গোসল করবে।

১২. অজানা শব্দ শ্রবণ করা

১. ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা।

২. স্বপ্নে কাউকে ডাকতে দেখা।

৩. জাগ্রত অবস্থায় আওয়াজ শোনা অথচ কাউকে দেখতে না পাওয়া।

৪. ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হওয়া।

৫. নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।

৬. স্বপ্নে উচুঁ স্থান থেকে নিচে পড়ে যেতে দেখা।

৭. স্বপ্নে ভয়ঙ্কর জন্তুকে দেখতে পাওয়া যা তাকে তাড়া করছে।

এ জাতীয় যাদু যেভাবে করা হয়ে থাকে

যাদুকর কোন জ্বীনকে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে যে, অমুক ব্যক্তিকে নিদ্রা ও জাগত অবস্থায় ভীতিজনক কিছু দেখাও, অত:পর সেই জ্বীন নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে ভয়ঙ্কর জন্তুর রূপ ধারণ করে ভীতি প্রদর্শন করে। আর কখনও জাগ্রত অবস্থায় ভীতিজনক আওয়াজে তাকে ডাকে। কখনও সে কণ্ঠ পরিচিত মনে হয় কখনো অপরিচিত। এ যাদু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কখনও মানুষ পাগল হয়ে যায় আবার কখনও ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রতিক্রিয়া যাদুর শক্তি অনুযায়ী কম বা অধিক হয়ে থাকে।

১. গ্রন্থে প্রাথমিক আলোচনায় যাদুর চিকিৎসার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তা অবলম্বন করবে।

২. অজ্ঞান হলে যেই পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে।

৩. যদি রোগী অজ্ঞান না হয় তবে চিকিৎসায় নিম্নের নির্দেশনা দিবে–
   - ক. ঘুমানোর পূর্বে ওযূ এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।
   - খ. রোগী দু'হাত প্রার্থনার মতো উঠাবে এবং সূরা, নাস, সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস তিনবার পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)
   - গ. সকালে সূরা সাফফাত পড়বে আর সূরা দুখান রাতে ঘুমানোর সময় পড়বে অথবা কমপক্ষে এ দু'টি সূরা শুনবে।
   - ঘ. তিন দিন অন্তর সূরা বাকারা পাঠ করবে অথবা শ্রবণ করবে।
   - ঙ. প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার নিম্নের দু'আ পাঠ করবে–

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

"অত:পর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও : আমার জন্যে তো আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই আমি তাঁরই ওপর ভরসা করছি, আর তিনি হচ্ছেন মহা আরশের মালিক।"

(সূরা তাওবা : আয়াত-১২৯)

চ. প্রত্যেক দিন রাতে নিদ্রা যাওয়ার সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ছ. শোয়ার সময় রোগী এ দু'আ পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاخْسِىْ شَيْطَانِى وَفُكَّ رِهَانِىْ، وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْاَعْلٰى.

জ. নিম্নের সূরা ক্যাসেটে রেকর্ড করে রোগীকে প্রত্যেহ তিনবার শুনাবে : সূরা ফুসলিলাত, সূরা ফাতাহ, সূরা জ্বীন।

এভাবে এক মাস চালাবে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

১৩. কাউকে যাদুর মাধ্যমে দৈহিকভাবে রোগী বানিয়ে দেয়া

এ যাদুর লক্ষণ

১. দেহের কোন অঙ্গে সর্বদা ব্যাথা থাকা।

২. দেহে ঝাকুনি বা খিঁচুনী এসে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

৩. দেহের কোন অঙ্গ অচল হয়ে যাওয়া।

৪. গোটা দেহ নির্জীব হয়ে যাওয়া।

৫. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটি কাজ না করা।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করতে হয় যে, এ লক্ষণগুলো সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তবে এর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে রোগীর উপর কুরআন পড়ে ঝাড়লে রোগী যদি কোনরূপ খিঁচুনী অনুভব করে অবশ হয়ে যায়, অথবা সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অথবা দেহে কম্পন সৃষ্টি হয় অথবা মাথায় ব্যাথা অনুভব হয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীরকে যাদু করা হয়েছে। আর এমনটি না হলে বুঝতে হবে যে এটা সাধারণ রোগ ডাক্তার দিয়ে এর চিকিৎসা করতে হবে।

যেভাবে এ যাদু হয়ে থাকে

এটা সবার কাজেই জানা যে, মানুষের মস্তিষ্ক সব অংশের মূল দেহ যে কোন অংশকে মস্তিস্ক পরিচালনা করে এবং বিপদ আসলে বিপদ সংকেত নিয়ে অঙ্গকে হেফাজত করে। আর তা সেকেণ্ডের কম সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকে।

فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ـ

এটা আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহ ছাড়া যে (সব মিথ্যা) ইলাহ রয়েছে তাদের সৃষ্ট কিছু আমাকে দেখাও। (সূরা লোকমান : আয়াত-১১)

যখন মানুষ এ জাতীয় যাদুতে আক্রান্ত হয় তখন জ্বীন লোকটির মস্তিষ্ককে আয়ত্বে নিয়ে আসে। অত:পর যাদুকর যে অঙ্গের সমস্যা করতে বলে সে জ্বীন সেই অঙ্গের সমস্যাই করে। অতএব হয়ত জ্বীন মানুষের শ্রবণশক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র বিন্দুতে প্রভাব বিস্তার করে অথবা মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্ক যে কোন অঙ্গে রগ যার সম্পর্কে অঙ্গে প্রভাবিত করে এমতাবস্থায় অঙ্গ তিনটি অবস্থায় পতিত হতে পারে।

এর তিন অবস্থা

১. জ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে কোন অঙ্গে চালিকা শক্তি একেকবার নিস্তেজ করে দেয়, তখন সে অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যায়। ফলে সে রোগী সম্পূর্ণরূপে অন্ধ অথবা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে।

২. অথবা জ্বীন আল্লাহর শক্তির দ্বারাই কোন অঙ্গেও চালিকা শক্তি অচল করে আবার কখনো ত্যাগ করে, যার ফলে সে অঙ্গ কখনো ঠিক হয়ে যায় আবার পুনরায় সে আক্রান্ত হয়ে যায়।

৩. অথবা রোগীর মস্তিষ্কের চালিকা শক্তি বরাবর চলমান থাকা অবস্থায় তার কোন অঙ্গ ছিনিয়ে নেয় তখন আর নড়াচড়া থাকে না। যার জন্যে অঙ্গগুলোর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় যদিও তা অবশ নয়। আর আল্লাহ তা'আলা যাদুকরদের প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন–

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

আর তারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কাউকে ক্ষতি করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদুকর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কাউকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই সমস্ত রোগ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় নাজাত পায়। ঔষধ ব্যতীতও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আল্লাহর

ইচ্ছায় রোগমুক্তি হয়, অনেক ডাক্তারই তো মানতে চায় না। তবে বাস্তব প্রমাণ দেখার পর তারা মানতে বাধ্য হয়।

আমার নিকট এক ডাক্তার এসে বলতে লাগল যে, আমি একটি বিষয়ে এসেছি যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে ফেলেছে। আমি বললাম কি সেই ব্যাপার? সে বলল : এক ব্যক্তি আমার কাছে তার একটি সন্তান নিয়ে আসল যে পোলিও আক্রান্ত অর্থাৎ তার সন্তানটির দেহ অচল অবস্থা হয়েছিল। যখন আমি চেক-আপ করে জানতে পারলাম যে, সে মেরুদণ্ডজনিত এমন রোগে আক্রান্ত যার কোন চিকিৎসা নেই। অপারেশনও বিফল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর লোকটি আমার কাছে আসলে আমি তার সেই চার হাত পা অচল সন্তানটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে : আলহামদুলিল্লাহ এখন সে বসে এমনকি দেয়ালের উপর দিয়ে চলে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তোমার সন্তানকে কার নিকট থেকে চিকিৎসা করেছ?

জবাবে সে বলল : শায়খ ওহীদের নিকট।

ডা : বলল : তাই আমি আপনার নিকট বিষয়টি জানতে এসেছি যে, আপনি তার চিকিৎসা কিভাবে করেছেন?

আমি সেই ডাক্তারকে বললাম, আমি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং কালো জিরার তেলের উপর ফুঁ দিয়ে অবশ অঙ্গগুলোতে মালিশ করতে বললাম। আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। এসব আল্লাহর মহিমা আমার নিকট কিছুই নেই।

এ জাতীয় যাদুর চিকিৎসা

১. যেমন আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি অনুরূপ, রোগীর সামনে কুরআনের আয়াত তিনবার তিলাওয়াত করার পর রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে চিকিৎসা করতে হবে।

২. আর যদি রোগী অজ্ঞান না হয় আর সামান্য লক্ষণ কেবল দেখা দেয় তবে নিম্নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে: ক্যাসেটে সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা দুখান, সূরা জ্বীন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ছোট সূরা বাইয়্যিনা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত রেকর্ড করে রোগীকে দিবে। আর রোগী তা প্রত্যেকদিন তিনবার শ্রবণ করবে।

এছাড়া রোগীকে কালো জিরার তেলের সাথে নিম্নের দু'আ আয়াত ও সূরাগুলো পড়ে ফুঁ দিয়ে এবং গুরুত্বের সাথে রোগীর কপালে ও ব্যথিত স্থানে সকাল-সন্ধ্যা মালিশ করতে বলবে।

সে সব আয়াত ও সূরা হলো : ১. সূরা ফাতেহা, ২. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

৩. এ আয়াতটি وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ সাতবার পড়বে।

৪. بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ

৫. اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا

ষাট দিন পর্যন্ত এ আমল করবে। সুস্থ হলে তো ভালো আর না হয় দ্বিতীয়বার উক্ত ঝাড়-ফুঁক করবে। অত:পর একই পদ্ধতি গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়বারের মতো অনুরূপভাবে যা তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন সেভাবে পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

এ জাতীয় চিকিৎসার কতিপয় উদাহরণ

এক মাস পর্যন্ত এক মেয়ে কথা বলে না

একমাস থেকে এক মেয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। সে নিজের ভাই এবং বাবার সাথে আমার নিকট আগমন করল। তারা বললেন, তার মুখ এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, খাওয়া-দাওয়ার জন্যেই তার মুখ জোর করে খুলতে হয়। তারা বললেন, এমন অবস্থা তার ৩৫ দিন ব্যাপী। তারপর ওর উপর যখন কুরআন পাঠ করলাম আর সে তা শুনে কথা বলা আরম্ভ করল আলহামদুলিল্লাহ। অত:পর সে বাকশক্তি ফিরে পেল।

জ্বীনে এক নারীর পা ধরে রাখা

এ নারী আমার নিকট এসে বলল, তার পায়ে অত্যন্ত ব্যাথা। আমি ধারণা করলাম যে, হয়তো তার পা কোন ব্যাধির কারণে এমন হয়েছে। কেননা সে একেবারেই পা উঠাতে পারছিল না।

তবুও আমি ঝাড়-ফুঁক আরম্ভ করলাম। সেই নারী সূরা ফাতেহা শোনামাত্রই বেহুঁশ হয়ে গেল। আর জ্বীন কথা বলতে লাগল। সে বলল : সে এই মহিলার পা

ধরে রেখেছে। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাইলে এ নারী ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও। আলহামদুলিল্লাহ সেই মহিলা থেকে জ্বীন বের হয়ে গেল। আর সে হাঁটা আরম্ভ করল।

এক ব্যক্তির চেহারা জ্বীন বাঁকা করে দিয়েছিল

একদিন এক ব্যক্তি আমার নিকট আসল যার চেহারা ডান দিক ঘুরানো ছিল। আমি যখন তাকে উক্ত ঝাড়ফুঁক করলাম তখন জ্বীন কথা বলল : এ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে যার জন্যে আমি তার চেহারা ঘুরিয়ে দিয়েছি। অত:পর আমি জ্বীনকে উপদেশ দিলাম যার ফলে আলহামদুলিল্লাহ জ্বীন সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিল। আর সেই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে দাঁড়াল ও তার চেহারাও সোজা হয়ে গেল।

এমন এক কন্যার ঘটনা যার চিকিৎসায় ডাক্তারও অপারগ

একদিন এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, তার কন্যা হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বেহুশ হয়ে যায় এরপর দু'মাস পর্যন্ত কথা বলতে পারে না। শুধু এখন শুনতে পায়। খাবার খেতে পারে না, আর না সে তার দেহের কোন অঙ্গ নড়া-চড়া করে। বর্তমানে সে সৌদি আরবের আবহা হাসপাতালে চিকিৎসারত আছে। ডাক্তারগণ বলেছেন তার জন্য সকল প্রকার টেস্ট করা হয়েছে; এমন কি একজন ডাক্তার বলেন তার সব রিপোর্ট ভালো; কিন্তু বুঝে আসছে না এর মূল তথ্য ও রহস্য কি। এখন সে কঠিন মুহূর্তে সময় কাটছে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্যে তার গলা ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে। আর নাক দিয়ে পাইপের মাধ্যমে তার পেটে খাবার দেয়া হয় যাতে বাকী জীবন এভাবে চলতে পারে।

আমি চিকিৎসার জন্যে কারো নিকট গমন করি না; যদিও সে যে কেউ হোক, সে যেহেতু আমার এক প্রিয় বন্ধু এবং বড় আলেম শায়খ সাঈদ ইবনে মুসাফির ক্বাহতানীর মাধ্যমে নিয়ে আমার নিকট এসেছিল এজন্য বাধ্য হয়ে আমাকে সাথে যেতে হয়।

হাসপাতালে প্রবেশের বিশেষ অনুমতি পাওয়ার পর উপরিউক্ত কন্যার চিকিৎসার জন্যে তার নিকট পৌছলাম। সেখানে দেখতে পেলাম যে, মেয়েটি বোবা হয়ে তার বিছানায় শুয়ে আছে। সে শুনতে ও দেখতে পায় মাত্র; কিন্তু বলতে পারে না, এক মাথা ছাড়া কোন কিছু নড়াতেও পারছে না এবং দুর্বল হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আমি তাকে কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে মাথায় না বোধক জবাব দেয়। আমি বুঝতে পারলাম

না তার কি হয়েছে। এরপর আমি সালাত আদায়ের জন্যে মসজিদে গেলাম সেখানে সালাত আদায় করে তার সুস্থতার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করি এবং ফিরে এসে আমি তার মাথায় হাত রেখে সূরা ফালাক্ব তেলাওয়াত করি এবং নিম্নে দু'আটি পড়ি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقْمًا.

অত:পর মেয়েটি আল্লাহর দয়ায় কথা বলতে লাগল। তার বাবা ও ভাই খুশিতে কেঁদে ফেলল। তার পিতা আমার মাথায় চুম্বন করতে চেষ্টা করলে আমি তাকে বললাম যে, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এসব আল্লাহ্ তা'আলার পরম করুণা। এরপর মেয়েটি বলল যে, আমি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে যেতে চাই। অত:পর তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল।

জ্বীনের যাদুর স্থান দেখানো

এক অসুস্থ যুবক আমার নিকট আসল। যখন আমি তার সামনে কুরআনের আয়াত পড়লাম তখন তার ভিতরের জ্বীন কথা বলতে লাগল : সে যাদুর দায়িত্বপ্রাপ্ত তাকে অমুক ব্যক্তি যাদু করেছে। আর যাদুর জিনিসগুলো এক খুঁটির মধ্যে রাখা আছে। এরপর আমি জ্বীনকে বের হয়ে যেতে বললাম। অত:পর সে বের হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ্। আর রোগীর লোকজন খুঁটির নিচে কিছু এলোমেলো কাগজের টুকরা পেল যাতে কিছু কিছু অক্ষর লিখা আছে। তারা সেগুলো পানিতে নিক্ষেপ করে যাদুকে নি:শেষ করে দিল। আলহামুদলিল্লাহ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

১৪. ইস্তেহাযা অর্থাৎ জরায়ু থেকে অনিয়মিত দীর্ঘ মেয়াদী স্রাবের যাদু

এই যাদুর বিবরণ

এ জাতীয় যাদুর মাধ্যমে শুধু মহিলারাই আক্রান্ত হয়ে থাকে। যে মহিলাকে স্রাব প্রবাহিত করিয়ে যাদু করা হয় যাদুকর সে নারীর দেহে জ্বীন প্রেরণ করে সেই জ্বীন তখন তার রগে রক্তে চলতে থাকে। যেমন :

নবী করীম ﷺ বলেছেন : "শয়তান আদম সন্তানের ভেতরে রক্ত প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

জ্বীন যখন নারীর জরায়ুর বিশেষ রগ পর্যন্ত পৌঁছে ওটাকে আঘাত করে; যার ফলে সেই রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। নবী করীম ﷺ হামনা বিনতে

জাহাশের ইস্তেহাযা বিষয়ের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন এটাতো শয়তানের একটি আঘাত করার ফল। (হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ্) অন্য এক বর্ণনাতে আছে "এটা তো রগের রক্ত হায়েয নয়।" (নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ)

উভয় বর্ণনা একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, ইস্তেহাযা সেই সময়ই হয়ে থাকে যখন শয়তান নারীর জরায়ুতে রগগুলো রয়েছে তার কোনটিতে যখন আঘাত হানে।

রক্ত স্রাবের যাদু

মুসলিম মনীষীগণ এ রক্তের নামকরণ করেছে ইস্তেহাযা আর ডাক্তারগণ তাদের পরিভাষায় বলে জরায়ু স্রাব।

আল্লামা ইবনে আসীর বলেন, ইস্তেহাযা বলা হয় ঋতু স্রাবের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ে রক্ত প্রবাহিত হলে। (নিহায়া : ১/৪৭৯) এর সময়সীমা কয়েকমাস পর্যন্ত হতে পারে। রক্তের পরিমাণ কখনও কম হয় কখনও বেশি।

চিকিৎসা

উপরিউক্ত ঝাড়-ফুঁক পানিতে পড়ে সে পানি পান করবে ও তা দ্বারা গোসল করবে। তিনদিন তা ব্যবহার করলে আল্লাহর আদেশে স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। দীর্ঘ সময় পার হলেও যদি রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয় তবে 'লিকুল্লি নাবায়িন মুসতাক্বর" এ আয়াতকে পরিচ্ছন্ন কালির মাধ্যমে লিখে পানিতে গুলিয়ে রোগীকে দুই অথবা তিন সপ্তাহ পান করাবে। ইনশাআল্লাহ্ রোগ থেকে নাজাত পাবে।

এ যাদুর চিকিৎসার এক বাস্তব উদাহরণ

এ রোগে আক্রান্ত এক নারী আমার নিকট আসল। অত:পর আমি তাকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে ঝাড়লাম এবং কুরআনের ক্যাসেট শুনার জন্যও দিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ সে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর কুরআনের আয়াত বৈধ কালি দ্বারা লিখিত আয়াতকে পানিতে মিশায়ে সে পানি পান ও তা দ্বারা গোসলের বৈধতার শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) অভিমত প্রকাশ করেছেন। (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া ১৯/৬৪)

১৫. বিয়ে ভাঙ্গার যাদু

এ যাদু করার বিবরণ : বিয়ের বিরোধী ও হিংসুক ব্যক্তি খবীস যাদুকরের নিকট গমন করে আবদার করে যে, অমুকের মেয়েকে এমন যাদু কর যেন সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।

যাদুকর তাকে বলে, এ কাজ সহজ তুমি শুধু সেই মেয়ের কোন বস্তু যেমন : চুল, কাপড় ইত্যাদি এনে দাও। আর তার ও তার মার নাম এনে দাও। এরপর কাজ সহজ হয়ে যাবে। যাদুকর এ কাজের জন্যে জ্বীন নির্ধারণ করে। অত:পর জ্বীন সেই সন্তানের পিছু নিতে থাকে। আর নিম্নের যে কোন এক অবস্থায় পেলে তার মধ্যে প্রবেশ করে–

১. ভীত-সন্ত্রস্ত্র অবস্থা।
২. অতি মাত্রায় রাগান্বিত অবস্থা।
৩. অতি উদাসীন বা গাফিলতির অবস্থা।
৪. অতিমাত্রায় যৌন স্পৃহার অবস্থা।

এক্ষেত্রে জ্বীন দু'অবস্থার এক অবস্থা গ্রহণ করে

১. হয়ত মেয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তার অন্তরে ঘৃণা জন্মায় ফলে যে ব্যক্তিই তাকে প্রস্তাব দেয় তা প্রত্যাখ্যান করে।
২. মেয়েটির ভেতর প্রবেশ না করতে পারলে, সে ছেলের ভেতরে প্রবেশ করে তার অন্তরে ঘৃণা জন্মায় যে, পাত্রী অসুন্দর ও কুৎসিত। পরিণামে যে ব্যক্তিই সেই মেয়েকে প্রস্তাব দেয় বিনা কারণেই সে পরক্ষণেই প্রত্যাখ্যান করে যদিও প্রথমে সে রাজি ছিল। আর তা শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলেই, এরূপ অবস্থায় যাদুর প্রচণ্ডতার কারণে পুরুষ প্রস্তাবের জন্য মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার পর হতেই অস্থিরতা বোধ করত: তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় হয়ে যায় এর বিপরীতও হতে পারে।

এ যাদুর লক্ষণসমূহ

১. বিভিন্ন সময়ে মাথা ব্যথা হওয়া যার চিকিৎসা কোন ঔষধে হয় না।
২. মানুসিক অশান্তি বিশেষ করে আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত।
৩. বিয়ের প্রস্তাবকারীকে খুব খারাপ মনে হওয়া।
৪. সর্বাদায় মস্তিষ্কে অশান্তি বিরাজ করা।
৫. ঘুমের মধ্যে স্বস্থি না পাওয়া।

৬. পেটে সর্বদায় ব্যাথা অনুভব করা।

৭. পিঠের নিম্নাংশে জোড়ে ব্যথা অনুভব হওয়া।

এ জাতীয় যাদুর চিকিৎসা

১. আপনি উল্লেখিত আয়াতগুলো ও দু'আ পাঠ করে ঝাড়বেন। তবে যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর জ্বীন কথা বলতে থাকে তবুও সেই পূর্বের উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

২. আর যদি রোগী অজ্ঞান না হয় আর দেহ অন্য ধরনের পরিবর্তন অনুভব করে তবে তাকে নিম্নের নির্দেশনা মেনে চলার জন্যে বলতে হবে–

১. সকল সালাত সঠিক সময়ে আদায়ের পাবন্দি থাকতে হবে।

২. গান-বাজনা থেকে বেঁচে চলতে হবে।

৩. শয়নের পূর্বে অযু করে আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবে।

৪. দু'হাত তুলে শয়নের পূর্বে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে গোটা দেহ স্পর্শ করবে (এমনটি তিনবার করবে)

৫. আয়াতুল কুরসী এক ঘণ্টার ক্যাসেটে বার বার রেকর্ড করে দৈনিক একবার শ্রবণ করে।

৬. অন্য একটি এক ঘণ্টার ক্যাসেটে বার বার সূরা ফালাক, নাস ও ইখলাস রেকর্ড করে দৈনিক কমপক্ষে একবার শ্রবণ করবে।

৭. পূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো ও দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে পান করতে বলবে এবং সেই পানি দিয়ে গোসল করাবে। এ কাজটি তিন দিন করবে। আর গোসল কোন পবিত্র স্থানে করবে।

৮. রোগী অবশ্যই ফজরের সালাতের পর দৈনিক

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

একশ'বার পাঠ করবে।

৯. শরয়ী পর্দা মেনে চলবে।

এক মাস পর্যন্ত এ আমল করবে। এরপর দু'টি অবস্থায় একটি হবে : ইনশাআল্লাহ হয়ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে অথবা তার কষ্ট বাড়বে এবং কুরআন পড়ে রোগীকে ঝাড়লে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় পূর্বের বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

বিয়ে ভাঙ্গার যাদুর চিকিৎসার এক উদাহরণ

এক এমন মেয়ের কাহিনী, যে রাতে বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করে, সকালে অস্বীকার করে। একদিন আমার নিকট এক যুবক এসে বলল, আমাদের এক মেয়ের বিষয়টি খুবই আশ্চর্যের। সে রাতে বিয়ের প্রস্তবে সম্মতি প্রকাশ করে, আর সকাল বেলা অস্বীকার করে। তাতে কোন যৌক্তিক কারণও থাকে না। আর বিষয়টি বার বার এমন হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

আমি তাকে বললাম, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। সুতরাং সে মেয়েটিকে নিয়ে আসল। আমি যখন দু'আ ও কুরআনের আয়াত পাঠ করে ঝাড়লাম মুহূর্তেই সে বেহুঁশ হয়ে গেল। এরপর তার মধ্যে প্রবেশ করা জ্বীন কথা বলতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে?

জবাবে বলল : আমি অমুক জ্বীন।

আমি বললাম : তুমি এ মেয়েটিকে কেন কষ্ট দিচ্ছ?

জবাবে বলল : আমি তাকে ভালোবাসি।

আমি বললাম : এটাতো তোমার ভালোবাসা নয়। তুমি আসলে কি চাও?

সে বলল : আমি চাই, এ মেয়ে যেন বিয়ে না করে।

আমি বললাম : তুমি তাকে কিভাবে প্রতারিত কর, যাতে সে বিয়েতে অস্বীকার করে?

জবাবে বলল : যখনই বিয়ের জন্যে তার নিকট কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসে সে সম্মতি প্রকাশ করে; কিন্তু রাতে তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে আমি ভয় দেখাই যে তুমি যদি বিয়ে কর তবে তোমার জন্য তা অকল্যাণ হবে।

আমি বললাম : তোমার ধর্ম কি?

সে বলল : ইসলাম।

আমি বললাম : তবে তোমার জন্য এটা না জায়েয। কেননা নবী করীম ﷺ বলেন, "তুমি নিজেও ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতির কারণও হবে না।"

(ইবনে মাজাহ : ২৩৪০)

অথচ তুমি যা করছ তা একজন মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছ। আর এটা শরীয়তে না জায়েয। শেষ পর্যন্ত সেই জ্বীন আমার কথায় প্রভাবিত হলো এবং বের হয়ে গেল। তার জ্ঞান ফিরে সে সুস্থ হয়ে গেল। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।

যাদুর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

১. যাদুর লক্ষণসমূহ আর জ্বীনে ধরা লক্ষণসমূহ এক হতে পারে।

২. সর্বদা পেটে ব্যাথা হলে বুঝতে হবে, যাদু করে খাওয়ানো হয়েছে অথবা পান করানো হয়েছে।

৩. কুরআনে কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা ফলফস্ হওয়া দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে–

প্রথমত : চিকিৎসকের আল্লাহ তা'আলার বিধানের অনুসারী হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : রোগীর কুরআনের চিকিৎসার কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

৪. অন্তরে অস্থিরতা বিশেষ করে রাতে। এ লক্ষণটি বেশির ভাগ যাদুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৫. যাদুর স্থান দু'ভাবে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে : যাদুতে নির্ধারিত জ্বীনের সত্য খবরে যে অমুক স্থানে যাদুর পোশাক রয়েছে। তবে জ্বীনের কথা যাঁচাই না করে বিশ্বাস করা যাবে না কেননা তারা সাধারণত মিথ্যাই বলে।

দ্বিতীয়ত : রোগী অথবা ডাক্তার ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে ফযীলতপূর্ণ সময়ে যেমন : রাতের শেষভাগে দুই রাক'আত নামায আদায় করবে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আল্লাহ যেন যাদুর স্থান জানিয়ে দেয়। এর ফলে স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারবে অথবা ধারণা সৃষ্টি হবে। অত:পর সে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

৬. কালো জিরার তেলে ঝাড়-ফুঁক করে রোগীকে সকাল-সন্ধ্যায় ব্যাথার স্থানে উক্ত তেল মালিশ করতে বলতে হবে। এটি সবধরনের যাদুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন–

اَلْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ.

অর্থাৎ, "কালো জিরা প্রত্যেক রোগের ঔষধ মৃত্যু ছাড়া।"

(বুখারী : ৫৬৮৭ ও মুসলিম : ২২১৫)

এমন এক মেয়ের কাহিনী যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের মাধ্যমে যাদুর জায়গা জানিয়ে দিয়েছেন

এমন একটি মেয়ে আমার নিকট আসলে, আমি কুরআনের আয়াত পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করলে বুঝতে পারলাম যে, তাকে শক্তিশালী যাদু করা হয়েছে। আমি বাড়ির লোকজনকে এ চিকিৎসার বিষয়ে বললাম এটি ব্যবহার কর ইনশাআল্লাহ যাদু তার স্থানেই নষ্ট হয়ে যাবে। (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) তারা বলল, এমন পদ্ধতি বলে দিন, যাতে যাদুর স্থান কোথায় জানতে পারি?

আমি বললাম : বিশেষ করে রাতের শেষভাগে যখন দু'আ কবূল হয় কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। রোগী সালাতে দাঁড়িয়ে যায় আর আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করে (যা তারা বর্ণনা করে), তারপর রোগী স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তার হাত ধরে ঘরের সেই স্থানে নিয়ে গেল যেখানে যাদু লুকানো হয়েছে। সকালে সে বাড়ির সকলকে স্বপ্নের কথা বলল। আর বাড়ির মানুষ তার বলা স্থান খোঁজ করতে থাকল। অল্প মাটি খননের পর তারা যাদুর পুঁটলি খুঁজে পেল যা তারা জ্বালিয়ে দেয়। এরপর আলহামদুলিল্লাহ যাদু নি:শেষ হয়ে যায়। আর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ যায়।

১৬. স্ত্রী সহবাসে হঠাৎ অপারগ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা

হঠাৎ অপারগতা বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্ম নেয়া ও সাধারণ রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াই কোন পুরুষের তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অক্ষম হওয়া। আমরা যদি এ অপারগতা সম্পর্কে জানতে চাই তবে আমাদেরকে প্রথমে লিঙ্গ শক্ত হয় কিভাবে তা জানতে হবে। এটা সকলেরই জানা যে, পুরুষাঙ্গ রাবারের মতো চিকন গোশতের এক খণ্ড। যখন রক্তের চাপ এর উপর বাড়ে তখন সেটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর যখন রক্তের চাপ হ্রাস পায় তখন ঢিলে হয় ও শক্তি শেষ হয়ে যায়।

যৌনাঙ্গের তিনটি স্তর

১. যখন পুরুষের মধ্যে যৌন চাহিদা সৃষ্টি হয় তখন পুরুষের অন্তকোষের মধ্যে বিশেষ এক জাতীয় হরমোনের সৃষ্টি হয়। আর এ হরমোন যখন রক্তের সাথে মিশে যায় তখন রক্ত অতিদ্রুত সঞ্চালিত হয়ে মাথার চামড়া পর্যন্ত পৌছে যায় এবং দেহ গরম হয়ে বিদ্যুতে সঞ্চালনের মতো হয়ে যায়।

২. যেহেতু যৌন চাহিদার নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্ক করে, তাই এটা পুরুষাঙ্গের গতি দ্রুত কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দেয়।

৩. মগজের যৌন উত্তেজনার কেন্দ্র বিন্দু প্রজনন কোষে দ্রুত স্প্রিট প্রেরণ করে যার ফলে পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে যায়।

যৌন ক্ষমতা ধ্বংসের যাদুর বর্ণনা

যাদুর দায়িত্বে নিয়োজিত শয়তান পুরুষের মস্তিষ্কে যা যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণকারী ও কেন্দ্রবিন্দু তাতে প্রভাব বিস্তার করে। আর অন্য সব অঙ্গ ভালো থাকে। আর যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন শয়তান সেই পুরুষের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে যৌন শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। যার ফলে রক্ত সঞ্চালন মেশিন চলে না আর যৌনাঙ্গের রক্ত ফিরে যায়। ফলে পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

এজন্য দেখা যাবে এ জাতীয় পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে চুম্বন ও আলিঙ্গনে থাকে তখন তার যৌন ক্ষমতা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যৌনাঙ্গ প্রবেশকালীন সময়ে ঢিলে পড়ে যায় এবং সে বিফল হয়ে যায়।

আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যখন একটি পুরুষের দু'টি স্ত্রী তখন সে তার মধ্যে একটির সাথে সহবাস তো করতে পারে; কিন্তু অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হয়। এটা এজন্যে যে, যাদুর শয়তান একজনের থেকে দূরে রাখার জন্যে সে যখন দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট যায় যৌন উত্তেজনার কেন্দ্র নষ্ট করে দেয়।

নারীর সহবাসে ব্যর্থ হওয়া

পুরুষের যেমন স্ত্রী হতে অপারগতা সৃষ্টি হয় তেমনি নারীরও পুরুষ থেকে অপারগতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর মেয়েদের অপারগতা পাঁচ ধরনের–

১. **স্ত্রী তার স্বামীকে তার নিকট আসতে বাধা দেয় :** এজন্য সে তার জবাবে একটির সাথে অপরটি মিলিয়ে দেয়, যাতে তার স্বামী সহবাসে সক্ষম না হয়। তার এ কাজ করে অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। এমনকি এক যুবকের স্ত্রী এ যাদু দ্বারা আক্রান্ত ছিল। তার স্ত্রী সহবাসের সময় দুই উরুর রান একত্রিত করে ফেলত তাতে সে তার স্ত্রীকে গালি গালাজ করত। জবাবে তার স্ত্রী বলত বিষয়টি আমার ইচ্ছাধীন নয়। তুমি বরং আমার উরুর মধ্যে লোহার বালা দিয়ে রেখো কাজ করার পূর্বে যাতে মিলিত না হয়ে যায়। বাস্তবে তার স্বামী এরূপ করল; কিন্তু এরপরও সে ব্যর্থ হলো। এরপর তার স্ত্রী তাকে

পরামর্শ দিল যে, সে যেন তাকে নেশাযুক্ত ইঞ্জেকশন দেয়। এরপর স্বামী তাকে ইঞ্জেকশন দিল এবং সে তার কর্মে সফল হলো; কিন্তু সহবাসের কর্ম শুধু স্বামীর পক্ষ হতে হলো।

২. **মস্তিষ্কের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা :** নারীর মস্তিষ্কের অনুভূতি শক্তির কেন্দ্রবিন্দু যাদুকরের জ্বীন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কাজেই স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন জ্বীন তার অনুভূতি শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়, যার কারণে নারীর প্রাকৃতিক অনুভূতি থাকে না। আর না নিজের স্বামীর সামনে কোন বিকর্ষণ সৃষ্টি হয় বরং সে সময় এ হতভাগ্য নারীর অবস্থা জড় পদার্থের মতো হয়ে যায়। আর অবশিষ্ট তার প্রাকৃতিক যেসব কিছু দেয়ার তা কিছুই দিতে পারে না, ফলে সহবাস একেবারে বিফল হয়ে যায়।

৩. **জরায়ু থেকে রক্ত প্রবাহ :** সহবাসের সময় রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে বর্ণিত ইস্তিহারা হতে এর পার্থক্য হলো এটি কেবল সহবাসের সময়েই প্রবাহিত হয়।

এর একটি কাহিনী হলো এক সেনা সদস্য যখন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসত তখন তার স্ত্রী রক্তপ্রবাহ শুরু হতো। আর যখন ছুটি শেষ হলে বাড়ি থেকে বের হত মুহূর্তেই তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে যেত।

৪. কুমারী মেয়েকে বিয়ের পর প্রথম রাতে তার স্বামী তাকে অকুমারী অনুভব করে, যার ফলে তাকে সন্দেহ করে বসে; কিন্তু যদি এ প্রকারের মেয়েকে চিকিৎসা করা হয় ও যাদু নষ্ট হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, সেই কুমারী।

৫. পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় তার সামনে গোশতের এক প্রতিবন্ধকতা পায়, যার ফলে তাদের সহবাস সফল হয় না।

অপারগকারী যাদুর চিকিৎসা

প্রথম পদ্ধতি

ইতোপূর্বে উদ্ধৃত পন্থায় চিকিৎসা করবেন। জ্বীনের সাথে কথা বলার পর যাদুস্থান প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কোথায়, অত:পর সেখান থেকে বের করতে পারলে যাদু শেষ হয়ে যাবে। অত:পর তাকে বের হতে বলবে এবং সে বের হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে, যাদুর প্রভাব নি:শেষ হয়ে গেছে। আর যদি জ্বীন রোগীর মাধ্যমে কথা না বলে তবে চিকিৎসার অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত কয়েকবার পাঠ করে পানিতে সাতবার ফুঁ দিবে এরপর রোগীকে পান করাবে এবং কিছু দিন সেই পানি দিয়ে গোসল করবে। আয়াতগুলো হলো–

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ، وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

"মূসা (আ.) বললেন, তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তা বিনাশ করে দিবেন। আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ্ সত্যকে তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।" (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮১-৮২) এটিও বেশি বেশি পড়বে, বিশেষ করে : اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ অংশটি অধিক পরিমাণে পাঠ করবে।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ، وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

"তখন আমি মূসা-এর নিকট এ ওহী প্রেরণ করলাম: তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আ.) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বড় সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে গিয়ে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু নির্মাণ করা হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার দলবলের জনগণ মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। যাদুকরগণ তখন সিজদায় লুটে পড়ল। তারা পরিষ্কার ভাষায় বলল : আমরা বিশ্ব পালনকর্তার প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো– কোন বিশ্ব পালনকর্তার প্রতি? তারা জবাবে বলল) মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি।" (সূরা আরাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

তৃতীয় পদ্ধতি : কুলের সাতটি সবুজ পাতা পাথর দিয়ে পিষে পানিতে ঢেলে নাড়তে থাকবে এবং নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করতে থাকবে আর ফুঁ দিতে থাকবে। আয়াতগুলো হলো এই আয়াতুল কুরসী সাতবার এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। আর সেই পানি রোগী পান করবে এবং গোসলও করবে কয়েক দিন পর্যন্ত।

ইনশাআল্লাহ্ রোগী আরোগ্য হয়ে উঠবে। সে পানিতে অন্য পানি মিশাবে না ও উক্ত পানি গরমও করবে না। যদি শীত থাকে তবে পানি রোদে গরম করতে পারে। আর খেয়াল রাখতে হবে যে, পানি যেন অপবিত্র স্থানে না পড়ে। তাতে ইনশাআল্লাহ যাদু প্রথমবার গোসলেই নষ্ট হয়ে যাবে।

চতুর্থ পদ্ধতি : উল্লেখিত ঝাড়-ফুঁক রোগীর কানে পাঠ করবে তার সাথে নিম্নের এ আয়াতটিও রোগীর কানে পাঠ করবে।

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا.

"আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে অগ্রসর হবো, অত:পর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব।" (সূরা ফুরকান : আয়াত-২৩)

আলোচ্য আয়াত রোগীর কানে একশ'বার অথবা তার বেশি পাঠ করবে। যে পর্যন্ত না রোগী বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এ আমল কয়েক দিন করতে থাকবে যে পর্যন্ত না রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাতে ইনশাআল্লাহ যাদু নি:শেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চম পদ্ধতি : হাফেজ ইবনে হাজার (র) এ ধরনের ঝাড়-ফুঁকের উপর ইমাম শাবী হতে প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন : ফহুল বারী ২৩৩/১০)

তাহলো বনের ভিতর থেকে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের পাতা একত্রিত করে পাথর দিয়ে পিষে মিহি করবে এবং তার ওপর কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁ দিবে এরপর তা পানিতে মিশাবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। (আমি মনে করি পানিতে সূরা ফালাক নাস এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ফুঁ দিবে তবে তা উত্তম হবে।)

৬ষ্ঠ পদ্ধতি : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, আমি জাফর মুস্তাগ ফিরির কিতাবে (চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ) ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি অধ্যয়ন করেছি যে, জাফর মুস্তাগফিরি বলেন আমি নাসুহ বিন ওয়াসেলের হাতে (কুতাইবনা ইবনে আহমদ বুখারীর ব্যাখার এক অংশে) লেখা পেলাম যে, কাতাদাহ সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয় তবে কি তার জন্যে ঝাড়-ফুঁকের

চিকিৎসা বৈধ? তিনি বললেন, ঝাড়-ফুঁকের উদ্দেশ্য তো সুস্থ করা তাই এতে কোন সমস্যা নেই। শরীয়তে মানব কল্যাণে কোন কার্যকর বিষয় নিষেধ নেই।

নাসুহ বলেন যে, হাম্মাদ শাকির আমাকে চিকিৎসার পদ্ধতির বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বলেন কিন্তু আমি বলতে পারিনি। এরপর তিনি আমাকে বললেন যে, যখন এমন ব্যক্তি যে, স্ত্রী সহবাস ব্যতীত অন্য সব কাজই করতে পারে, তবে এমন রোগী কিছু জ্বালানি বা লাকড়ী একত্রিত করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিবে এবং সেই আগুনের মাঝখানে একটি কুড়াল রেখে দিবে। আর যখন কুড়াল গরম হয়ে যাবে তখন সেটাকে বের করে তাতে পেশাব করে দিবে ইনশাআল্লাহ সে আরোগ্য লাভ করবে। (ফতহুল বারী খণ্ড ১০ পৃ: ২২৩)

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রোগী কুড়ালের উপর এমন কোন বিশ্বাস রাখবে না বরং তার বুঝতে হবে যে, এটা একটা মাধ্যম। কুড়ালের গরম তাপে যখন পুরুষাঙ্গ পড়ে তখন জ্বীন প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং সে বের হয়ে চলে যায়। অত:পর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে উঠে।

সপ্তম পদ্ধতি

একপাত্রে পানি নিয়ে তাতে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করবে এবং নিম্নের দু'আ পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ ارْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ .

অত:পর সেই পানিতে সাতবার ফুঁ দিবে এবং রোগী পর পর তিন দিন পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। ইনশাআল্লাহ যাদু বিনাশ হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আর কোন অপবিত্র স্থানে গোসল করবে না।

অষ্টম পদ্ধতি

রোগীর কানে নিচের আয়াত ও সূরা পাঠ করবেন–

১. সূরা ফাতেহা ৭০ বারের অধিক।

২. আয়াতুল কুরসী ৭০ বারের অধিক।

৩. সূরা ফালাক ও নাস

এগুলো পরপর তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত পাঠ করবেন। ইনশাআল্লাহ যাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

নবম পদ্ধতি

পরিষ্কার একটি পাত্রে পরিষ্কার কালি দিয়ে নিম্নের আয়াতগুলো লিখবে–

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

"মূসা বললেন, তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তা বিনাশ করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।" (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮১-৮২)

আলোচ্য আয়াত লেখার পর সেই পাত্রে কালো জিরার তেল ঢেলে তা নাড়া-চাড়া করবে। এরপর রোগী সেই তেল পান করবে এবং কপালে ও বুকে মালিশ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদু বিনষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিকিরসমূহ লিখে পানিতে গুলিয়ে তা রোগীকে পান করানো জায়েয। (মাজমাউল ফাতোয়া : ১৯/৬৪)

যৌনক্ষমতা লোপ, যৌন দুর্বলতা এবং পুরুষত্বহীনতার পার্থক্য

প্রথমত: যাদুর দ্বারা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা

এটি হলো, তার যেমন ক্ষমতা ঠিকই আছে বরং স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকলে তার যৌনাঙ্গ ঠিক, গরম ও কার্যকর থাকে। আর যখন সে স্ত্রীর নিকটবর্তী আর তার সাথে সঙ্গম করতে চায় সে মুহূর্তে একেবারে অক্ষম হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত : সাধারণ যৌন অক্ষমতা

স্ত্রীর নিকটে হোক আর দূরে সব সময়ের জন্যই সে পুরুষ যৌনাক্ষম; বরং তার পুরুষাঙ্গ কখনই শক্তিশালী হয় না।

তৃতীয়ত : যৌন শক্তির দুর্বলতা

স্বামী স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন পর ব্যতীত সহবাসে সক্ষম হয় না। তাও প্রতি অল্প সময়ের জন্য সে সক্ষম হয়। তার পরেই অতি তাড়াতাড়ি পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

চিকিৎসা

যাদুর দ্বারা নষ্ট করা যৌন শক্তির চিকিৎসার ইতিপূর্বেই নয়টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাধারণ যৌন অক্ষমতার জন্য ডাক্তারদের আশ্রয় নিতে হবে। তবে যৌন শক্তির দুর্বলতার চিকিৎসার জন্য নিচের পদ্ধতি গ্রহণ করবে–

১. এক কিলোগ্রাম মৌচাকের খাঁটি মধু এবং ২০০ গ্রাম দেশীয় রাণী মৌমাছির খাদ্য।

২. তার ওপর সূরা ফাতেহা, সূরা আলাম নাশরাহ্ এবং তিন কুল পাঠ করবে।

৩. তারপর রোগী সকালে খালি পেটে তিন চামচ, দুপুরে এক ও রাতে এক চামচ খাবার পরে খাবে।

৪. এ পদ্ধতি ১ মাস বা দু'মাস দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে চালিয়ে যাবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবে।

নি:সন্তান হওয়া বা বন্ধ্যাত্বের প্রকারভেদ

পুরুষের নি:সন্তান হওয়া

এটা দু'প্রকার প্রথম : যার সম্পর্কে পুরুষাঙ্গের সাথে এবং এর চিকিৎসা ডাক্তারের মাধ্যমে করতে হবে যদি তারা পারে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো মানুষের ভেতর জ্বীন ও শয়তানের দুষ্টক্রিয়া থেকে। এর চিকিৎসা কুরআনের আয়াতসমূহ ও যিকির এবং দু'আর মাধ্যমে করতে হবে। একটি বিষয় অনেকেরই জানা যে, সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা তখনই থাকে যখন পুরুষের বীর্যে বর্গ এক সেন্টিমিটারে বিশ মিলিয়নের বেশি শুক্রাণু কীট বিরাজ করে।

কখনও শয়তান পুরুষের শুক্রাশয়ে প্রভাব বিস্তার করে যা শুক্রাণুগুলোকে চাপ দিয়ে পৃথক করে। কাজেই যখন চাপ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তা আলাদা করতে পারে না এর জন্য কম হয় যার ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা কমে যায়। যখন কীটগুলো শুক্রাণুতে পরিণত হয় এ জীবাণুসমূহে তরল পদার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পদার্থ শুক্রাণুতে মিশ্রিত হওয়ার পর কীটগুলোর খাবারে পরিণত হয়। শয়তান এখানেও বাধা সৃষ্টি করে। যার পরিণামে তরল পদার্থ আর শুক্রাণুর খাবারে পরিণত হতে পারে না। যার জন্যে সেগুলোর মৃত্যু হয়। এরপর আর সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে না।

যাদুর বন্ধ্যাত্ব আর প্রকৃত বন্ধ্যাত্বের মধ্যে পার্থক্য

যাদুর দ্বারা হলে তার নিম্নের লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হবে :

১. রোগী আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত মানসিক অস্বস্তি অনুভব করবে।

২. মতিভ্রম হওয়া।

৩. মেরুদণ্ডের নিচে ব্যাথা।

৪. ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা।

৫. ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা।

নারীর বন্ধ্যাত্ব

এটাও দু'প্রকার। প্রথমত: সৃষ্টিগত দ্বিতীয় : যাদুর মাধ্যমে। যাদুর দ্বারা বশকৃত জ্বীন নারীর জরায়ুর ভেতরে প্রবেশ করে মহিলার যেই ডিম্বাণু রয়েছে তা নষ্ট করে দেয়, যার ফলে আর বাচ্চা ধরে না। অথবা কখনও সে জ্বীন ডিম্বাণু ক্ষতি করে না। অতএব জরায়ুতে বাচ্চা ধরে; কিন্তু গর্ভধারণের কয়েক মাস পরে শয়তান জরায়ুর কোন রগে আঘাত করে, যার ফলে স্রাব নির্গত হওয়া আরম্ভ হয়। পরে গর্ভপাত হয়ে যায়। বার বার গর্ভপাত অধিকাংশে জ্বীনের কারণে হয়ে থাকে। আর এ জাতীয় অবস্থার বহু চিকিৎসাও করা হয়ে থাকে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে– "নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের ন্যায় চলাচল করে।" (বুখারী : ৪/২৮২ ও মুসলিম : ১৪/১১৫)

যাদুর বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা

১. গ্রন্থের শুরুতে যে সব ঝাড়-ফুঁকের আয়াতগুলো ও দু'আ উদ্ধৃত হয়েছে তা এক ক্যাসেটে রেকর্ড করে শ্রবণের জন্যে রোগীকে দিবে। রোগী দৈনিক তিনবার শ্রবণ করবে।

২. সূরা সাফফাত সকালে পাঠ করবে অথবা শ্রবণ করবে।

৩. সূরা মাআরিজ রাতে পাঠ করবে অথবা শ্রবণ করবে।

৪. কালো জিরার তেলে নিচের সূরাগুলো পড়ে রোগীকে দিবে–

সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ রুকু, সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। এ সমস্ত আয়াত ও সূরা পড়ে তেলে ফুঁ দিবে এবং রোগী সেই কালো জিরার তেল দিয়ে তার বুকে কপালে ও মেরুদণ্ডে শোয়ার আগে মালিশ করবে।

৫. উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠ করার পর খাঁটি মধুতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে দিয়ে বলবে, সে যেন দৈনিক এক চা চামচ খালি পেটে খায়।

এ সব চিকিৎসা তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী রাখবে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশগুলো পালন করবে। যাতে সে ঐ সমস্ত খাঁটি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যাদেরকে আল্লাহ কুরআনের দ্বারা আরোগ্য দান করেছেন।

কেননা কুরআনের আয়াত দ্বারা সুস্থ হওয়ার হকদার শুধুমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিই। যেমন : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ.

"আমি কুরআন নাযিল করেছি যাতে রয়েছে আরোগ্য লাভের উপায় এবং রহমত স্বরূপ মু'মিনদের জন্যে।' (সূরা ইসরা : আয়াত-৮২)

দ্রুত বীর্যপাত হয়ে যাওয়া

অনেক সময় বিষয়টি স্বাভাবিক কারণে হয়ে থাকে যাদুর দ্বারা নয়। এমনটি হলে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করবে। সাধারণ ডাক্তারগণ নিম্নের নির্দেশনাগুলো পালন করতে উপদেশ দেয়।

১. এক জাতীয় মলমের ব্যবহার যা পুরুষাঙ্গের অনুভূতিকে স্বাভাবিক করে দেয়।

২. সহবাসের সময় অন্য কোন বিষয়ে ভাবতে থাকা বা অন্য মনস্ক হয়ে যাওয়া।

৩. সহবাসের সময় কঠিন হিসাব-নিকাশে মত্ত হয়ে যাওয়া।

আবার কখনও শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে যার চিকিৎসা নিম্নরূপ–

১. ফজরের নামাযের পর এ কালেমা ১০০ বার পাঠ করবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

২. শয়ন করার আগে সূরা মুলক শুনবে অথবা পড়বে।

৩. আয়াতুল কুরসী দৈনিক অধিক পরিমাণে পাঠ করবে।

৪. নিম্নের দু'আ সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে অথবা কারো থেকে শুনবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উদ্ধৃত দু'আগুলো প্রত্যহ তিনবার করে পাঠ করবে।

এ চিকিৎসা তিন মাস পর্যন্ত চালাবে ইনশাআল্লাহ্ আরোগ্য হয়ে উঠবে।

১৭. যাদু প্রতিরোধের উপায়

যে সমাজে যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয় এবং যাদুর প্রাদুর্ভাব বেশি, বিশেষ করে নব দম্পতির জন্য সেখানে আগেই এর বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার যে সব করণীয় বিষয় আছে তা এখানে বর্ণনা করা হবে। এক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রশ্নের গুরুত্ব রাখে : নব দম্পতির জন্য কি যাদু প্রতিরোধে কোন পন্থা রয়েছে, যার ফলে যদিও তাদের জন্য যাদু করা হয়; কিন্তু তাতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না? জবাবে : হ্যাঁ অবশ্যই পদ্ধতি রয়েছে, যা অচিরেই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্! কিন্তু তার পূর্বে পাঠকদের জন্য এঘটনাটি বর্ণনা করা উত্তম মনে করি।

এক মুত্তাকী যুবকের ঘটনা। সে একজন খতীব ও দায়ী, তার গ্রামে ছিল এক যাদুকর। যে মানুষকে যাদুর ভয় দেখিয়ে অর্থ লুটে নিত। গ্রামের যারা বিয়ে করতো বা করাতো তারা সবাই তাকে বিয়ের আগেই টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখত। সে যেন স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা সৃষ্টিকারী যাদুর মাধ্যমে ক্ষতি না করে।

আর এ মুত্তাকী যুবক এ যাদুকরের বিরুদ্ধে খুতবায় ও স্থানে স্থানে মানুষকে বলত এবং যাদুকরের কাছে যেতে নিষেধ করত। আর সে ছিল অবিবাহিত, এখন সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল; কিন্তু তার মনে ভয় যাদুকর হয়ত তাকে যাদু করবে। আর গ্রামের জনগণ তার বিষয়ে আশঙ্কা করছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই যুবক আমার নিকট এসে তার কাহিনী ও পরিস্থিতি বর্ণনা করল। বলল যে, যাদুকর তাকে ভয় দেখিয়েছে এখন কার জয় হবে গ্রামের মানুষ তার দেখার অপেক্ষায় আছে। আপনি আমাকে কি যাদুর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্যে কিছু বলতে পারেন?

যাদুকর আমাকে শক্তিশালী যাদু করবে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমার ক্ষতি করতে। কেননা আমি প্রকাশ্যে তাকে অপমান করেছি। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি

অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব, তবে শর্ত হলো যে, আপনি যাদুকরকে জানিয়ে দিবেন যে, আমি অমুক তারিখে বিয়ে করতে যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে চ্যালে করছি, তুমি যা ইচ্ছা তাই কর এমনকি সকল যাদুকরকে একত্রিত করে যাদু কর। আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

যুবক আমার কথায় সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হলো এরপর বলল, আপনি কি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই বিজয় ও সফলতা কেবল ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে আর লাঞ্ছনা ও অবমাননা অপরাধীদের প্রাপ্য।

অত:পর বাস্তবে তাই হলো যুবক আমার কথা মতো তার সাথে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে। আর লোকজন সেই কঠিন দিনের অপেক্ষা করতে থাকে। আমি যুবককে যাদু থেকে রক্ষার জন্যে কিছু আমল বলে দিলাম, যা নিম্নে বর্ণনা করব। এরপর যুবক বিয়ে করে বাসর রাত অতিক্রম করে। আর তা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যাদুকর বিফল ও অপদস্থ হয়। এরপর সবার কাছে যুবক সম্মানের পাত্র এবং যাদুকর লোকজনের দৃষ্টিতে অসম্মানিত হয়। আল্লাহু আকবার, তাঁরই সকল প্রশংসা, বিজয় তো এক আল্লাহর, তাঁরই সকল প্রশংসা বিজয় তো এক আল্লাহর পক্ষ হতেই।

এখন নিন যাদু প্রতিরোধের উপায়

প্রতিরোধের প্রথম উপায় : খালি পেটে সাতটি আজওয়া খেজুর খাওয়া- সম্ভব হলে মদীনা থেকে আজওয়া খেজুরের ব্যবস্থা করবে আর না হয় যে কোন ধরনের আজওয়া খেজুর চলবে। আল্লাহর রাসূলের হাদীসে রয়েছে : যে ব্যক্তি সাতটি আজওয়া খেজুর সকাল বেলায় আহার করবে সেদিন তাকে কোন বিষ ও যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।" (বুখারী : ১০/২৮৭)

দ্বিতীয় উপায় : ওযু অবস্থা থাকলে যাদুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না- কেননা এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের অঙ্গগুলোকে পবিত্র রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। কেননা যে ব্যক্তিই পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে বস্ত্রের ন্যায় তার দেহে এক সংরক্ষণ ফেরেশ্‌তা নির্ধারণ করে দিবেন। রাতের যে মুহূর্তে সে পার্শ্ব পরিবর্তন করবে তখনই ফেরেশ্‌তা তার জন্য প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে ক্ষমা কর সে ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়েছে।

তৃতীয় উপায় : জামাআতের সাথে সালাতের পাবন্দি হওয়া

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে শয়তানের ক্ষতি থেকে নিরাপদ হওয়া যায়। আর নামায থেকে গাফেল হলে শয়তান তাকে বশীভূত করে ফেলে। আবূ দারদা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন, যখন কোন গ্রামে অথবা মরুভূমিতে কমপক্ষে তিন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে অত:পর তারা যদি জামাআতের নামায় আদায় না করে তবে শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নেয়।

তাই তোমরা জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিও। কেননা বাঘের শিকার সেই ছাগল হয়ে থাকে, যে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(বুখারী : ৩/৩৪ ও মুসলিম : ৬/৬৩)

চতুর্থ উপায় : তাহাজ্জুদের সালাত আদায়

যে ব্যক্তি নিজেকে যাদুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে চায় সে যেন রাত্রির কিছু অংশ হলেও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে। এ থেকে একেবারে বিমুখ না থাকে কেননা তা থেকে বিমুখ থাকা শয়তানের প্রভাব পড়ার কারণ হয়ে থাকে। আর শয়তান যদি পেয়ে বসে তবে যাদু ক্রিয়া সহজ হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এক ব্যক্তির বিষয়ে অভিযোগ আনা হলো যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। এমনকি ফজরের সালাতও আদায় করতে পারেনি। অত:পর নবী করীম ﷺ বললেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী : ৬/৩৩৫, মুসলিম : ৬/৬৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি বেতের সালাত আদায় না করেই সকাল করে সে যেন মাথায় এক ৪০ গজ বিশিষ্ট রশি নিয়ে সকাল করে।" (ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করে বলেন তার সূত্র সঠিক : ৩/২৫)

পঞ্চম উপায় : বাথরুমে প্রবেশের সময় দু'আ পাঠ করা

বাথরুম ও অনুরূপ অপবিত্র স্থানে শয়তানের আস্তানা গড়ে ওঠে। আর শয়তান মুসলমানের বিরুদ্ধে এ জাতীয় স্থানে সুযোগ খুঁজে। লেখক বলেন, এক শয়তান জ্বীন আমাকে বলে, আমি এ ব্যক্তিকে আক্রমণ এজন্যে করেছিলাম যে, সে বাথরুমে যাওয়ার আগে আউযুবিল্লাহ পড়ত না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং আমি বললাম যে, এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। আলহামদুলিল্লাহ সে ছেড়ে চলে যায়।

এক জ্বীন আমাকে বলল যে, হে মুসলমানগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী অস্ত্র দান করেছেন ; তোমরা তা দিয়ে আমাদেরকে পরাস্থ করতে পার; কিন্তু তোমরা তা ব্যবহার কর না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তা কি? জবাবে সে বলল : নবী করীম ﷺ এর যিকিরসমূহ।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বাথরুমে প্রবেশকালীন সময়ে এ দু'আ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট জ্বীন ও দুষ্ট পরি থেকে।" (বুখারী : ১/২৯২, ফাতহ ও মুসলিম : ৪/৭০, নববী)

ষষ্ঠ উপায় : নামাযের শুরুতে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা–

যুবায়ের ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে দেখেছেন যে, তিনি সালাতে এ যিকিরসমূহ পড়ছিলেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا .

আর তিনবার পড়বে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ .

(আবু দাউদ)

বিয়ের পর নারীকে শয়তান থেকে হেফাজত করা–

পুরুষ যখন তার স্ত্রীর কাছে বাসর রাতে যাবে তখন তার কপালে হাত রেখে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .

উভয় দু'আর অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ নারীর থেকে কল্যাণ ও কল্যাণকর বস্তু চাই। আর সে যে সন্তান ধারণ করবে তার থেকেও কল্যাণ প্রার্থনা করি। (আলবানী হাসান বলেছেন)

অষ্টম উপায় : সালাত দ্বারা দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করা–

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন তোমার নিকট তোমার স্ত্রী বাসর রাতে আসবে তখন তুমি তাকে নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করে এবং নামাযের পর এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِىْ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلَى الْخَيْرِ.

হে আল্লাহ! আমার জন্যে আমার স্ত্রী ও ভবিষ্যত প্রজন্ম বরকতময় কর এবং আমাকে আমার স্ত্রীর জন্যে বরকতময় করে দাও। হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমরা উভয়েই একত্রে থাকি উত্তমরূপেই যেন থাকি, আর যদি আমাদের মাঝে কল্যাণ না থাকে তবে আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিও। (ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন আর আলবানী তা বিশুদ্ধ বলেছেন।)

নবম উপায় : সহবাসের সময় শয়তান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা–

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের জন্যে যাবে তখন এ দু'আ পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقَضٰى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ.

"আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উভয়কে শয়তান থেকে রক্ষা কর। আর আমাদের সন্তানদেরকেও শয়তান থেকে রক্ষা কর।"

(বুখারী ১/২৯২)

এ সঙ্গমে যে সন্তান জন্মলাভ করবে তাকে শয়তান কখনও ক্ষতি করতে পারবে না।

এক জ্বীন ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে বলল যে, সে যেই ব্যক্তিকে ধরেছিল সে যখনই নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত তখন আমিও তার সাথে শরীক হতাম। কেননা সে দু'আ পড়ত না। সুবহানাল্লাহ আমাদের নিকট কত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে যার মূল্য আমরা দেই না।

দশম উপায় : শয়ন করার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ কর

ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করবে, তারপর আয়াতুল কুরসী পড়ে আল্লাহর যিকির করতে করতে ঘুমিয়ে যাবে। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলল, যে ব্যক্তিই শয়ন করার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, সেই রাতে তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করেন। আর শয়তান সেই রাতে সেই ব্যক্তির কাছে সকাল পর্যন্ত যেতে পারে না।

নবী করীম ﷺ তার এ বর্ণনা স্বীকার করে বললেন : "হে আবু হুরায়রা শয়তান তোমাকে সত্যই বলেছে অথচ সে মিথ্যাবাদী।" (বুখারী : /৪৮৭)

একাদশ উপায় : মাগরিবের সালাতের পর এ আমলগুলো করা–

১. সূরা বাকারার ১-৫ আয়াত পড়া।

২. আয়াতুল কুরসী এবং এর পরের আয়াত।

৩. সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত।

এ আমলের দ্বারা আপনি ২৪ ঘণ্টা শয়তান ও সকল ধরনের যাদু থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

দ্বাদশ উপায় : ফজরের সালাতের পর নিম্নোক্ত কালেমা পাঠ করা–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْـكَ لَهٗ، لَـهُ الْمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْدُ وَهُـوَ عَـلٰى كُـلِّ شَـىْءٍ قَـدِيْـرٌ.

এটাকে ফজরের সালাতের পর ১০০ বার পাঠ করুন। নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিই পাঠ করবে সে দশটি দাস মুক্ত করার নেকী পাবে এবং একশত নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে এবং একশত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। আর এর থেকে অধিক পুণ্যের কাজ আর হতে পারে না; কিন্তু সেই যে এর বেশি আমল করবে।

(বুখারী ৬/৩৩৮ ও মুসলিম : ১৭/১৭)

ত্রয়োদশ উপায় : মাসজিদে প্রবেশকালীন সময়ে নিম্নের দু'আ পাঠ করা–

اَعُـوْذُ بِـاللّٰـهِ الْـعَـظِـيْـمِ، وَبِـوَجْـهِـهِ الْـكَـرِيْـمِ وَسُـلْـطَـانِـهِ الْـقَـدِيْـمِ مِـنَ الـشَّـيْـطَانِ الـرَّجِـيْـمِ.

আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তাঁর মহান চেহারার এবং তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

নবী করীম ﷺ হতে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত তিনি বলেছেন : "যে ব্যক্তিই তা পড়ল শয়তান বলে, এ ব্যক্তি আজ সারাটি দিন আমার থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।"
(আবু দাউদ : ১/১২৭ নববী ও আলবানী সহীহ্ বলেছেন)

চর্তুদশ উপায় : সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আ তিনবার পাঠ করা–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"শুরু করছি আল্লাহর নামে যার নামের সাথে যমীন আসমানের কোন বস্তুই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। আর তিনি সব শুনেন ও জানেন।
(তিরমিযী : ৫/১৩৩ সঠিক সূত্রে)

পঞ্চদশ উপায় : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পাঠ করা–

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

যখন আপনি এ দু'আ পাঠ করে বাড়ি থেকে বের হবেন তখন আপনার জন্য এক সুসংবাদ দেয়া হয় যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যে যথেষ্ট। আপনি সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেলেন, সঠিক পথ পেয়েছেন এবং শয়তান আপনার থেকে দূরে চলে গেল। আর এক শয়তান অন্য সাথী শয়তানকে বলে যে, তুমি এ ব্যক্তিকে কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা সে আজ সঠিক পথপ্রাপ্ত, তার জন্য যথেষ্ট এবং সুরক্ষিত।" (আবূ দাউদ : ৪/৩২৫ সনদ সহীহ)

ষষ্ঠদশ উপায় : ফজর ও মাগরিবের সালাতের পর নিম্নের দু'আ পাঠ করা–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ আশ্রয় গ্রহণ করছি।

সপ্তদশ উপায় : সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করা–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ ـ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার আশ্রয় প্রার্থনা করি তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে এবং তাঁর বান্দার ক্ষতি থেকে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে ও শয়তানের সংস্পর্শ থেকে।

অষ্টাদশ উপায় : সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا اَنْتَ اَخَذَ بِنَاصِيَةٍ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَاْثَمَ وَالْمَغْرَمَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَايَهْزِمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلِفُ وَعْدُكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

হে আল্লাহ! তোমার দয়ালু ও পবিত্র চেহারার মাধ্যমে এবং তোমার পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে যাবতীয় ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তোমার আয়ত্বাধীন রয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি পাপ ও দেনা মুক্ত কর। হে আল্লাহ! তোমার সেনাদল পরাস্থ হয় না আর না তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। আমরা তোমারই গুণকীর্তন ও প্রশংসা বর্ণনা করি।

উনবিংশ উপায় : সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়া

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَا شَىْءَ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ بَرَاَ وَمِنْ شَرِّكُلِّ ذِىْ شَرٍّ لَا اُطِيْقُ شَرَّهُ وَمِنْ شَرِّكُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهٖ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

আমি মহান আল্লাহর সুমহান চেহারার আশ্রয় প্রার্থনা করি যার থেকে বড় আর কিছু নেই এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালেমার মাধ্যমে আশ্রয় চাই যাকে ছাড়া কোন কল্যাণ ও ক্ষতি অতিক্রম করে না। আর আল্লাহ তা'আলা সুন্দর নামগুলোর মাধ্যমে যা আমি জানি ও যা জানি না আশ্রয় প্রার্থনা করি সৃষ্টি জগতের যাবতীয় ক্ষতি থেকে যা তোমার আয়ত্বাধীন। নিশ্চয় আমার রব সরল সোজা পথে।

বিংশ উপায় : সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করা

تَحَصَّنْتُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلٰهِيْ وَاِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ حَسْبِيَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

সেই আল্লাহকে রক্ষাকর্তা মেনেছি যাকে ছাড়া আমার কোন উপাস্য নেই। তিনি আমার এবং সকল কিছুর উপাস্য। আমি আমার প্রভুকে আঁকড়ে ধরেছি এবং সে চিরঞ্জীবির ওপর ভরসা রাখি যার মৃত্য নেই। এবং তাঁরই কাছে অনিষ্টকে দমন করার সামর্থ চাই কেননা শক্তি-সামর্থ কেবল আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আমার প্রভু বান্দাদের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্যে যথেষ্ট। সৃষ্টিকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে রক্ষার জন্যে। রিযিকদাতা হিসেবে আমার জন্যে যথেষ্ট, রিযিক গ্রহণকারীদের থেকে রক্ষা করতে। তাঁর কাছেই আশ্রয় নিতে হয় তাঁর বিরুদ্ধে নয়। আমার আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তাঁর উপরই আমার আস্থা এবং তিনিই মহৎ আরশের প্রভু।

যৌন ক্ষমতা নষ্টকারী যাদুর এক বাস্তব উদাহরণ

এ ব্যাপারে অনেক কাহিনী রয়েছে; কিন্তু সংক্ষেপে একটি ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছি।

এক যুবক তার যে ভাই নতুন বিবাহ করেছে তাকে আমার নিকট নিয়ে আসল। তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কবিরাজ যাদুকরের নিকট এসেছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

আমি যখন তা জানতে পারলাম তখন আমি তাকে প্রথম ইখলাসের সাথে তাওবা করলাম এবং সে যেন সেই সব দাজ্জালদেরকে মিথ্যুক বলে বিশ্বাস করে যাতে আমার চিকিৎসায় তার উপকার হয়। সে আমাকে বলল যে, এখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, তারা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। আমি তাকে সাতটি সবুজ ও তাজা বরই পাতা সংগ্রহ করতে বললাম; কিন্তু তা ব্যবস্থা হলো না। এরপর কর্পূরের সাতটি পাতা ব্যবস্থা করা হয় যা পাথরের শিলপাটা দিয়ে পিষে পানিতে মিশ্রিত করলাম এবং তাতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে ফুঁ দিলাম এবং তাকে বললাম, এ পানি সে পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে।

আলহামদুলিল্লাহ এ চিকিৎসার পর মুহূর্তেই তার ওপর যাদুর প্রভাব ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ জাতীয় যাদুর প্রভাবে পাগল হয়ে যায়

এক সচেতন যুবকের বিয়ের পর বাসর রাত থেকে পুরুষত্বহীন হয়ে আস্তে আস্তে কিছুদিন পর সে পাগল হয়ে গেল। তার ঘটনা ছিল যে, তার স্ত্রী যাদুকরের কাছে গিয়েছিল যে সে যেন তার স্বামীকে এমন যাদু করে তাতে, সে অন্য সব নারীকে ঘৃণার চোখে দেখে। যাদুকর এমনটিই করল; কিন্তু সে তার যাদুতে এমন কিছু ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করল যেন, পরবর্তীতে যখন মহিলা তার স্বামীকে যাদুর বস্তু খাবারের সাথে মিশিয়ে তার স্বামীকে খাওয়াল তখন থেকে তার স্বামী সকল মহিলাকে ঘৃণা করতে লাগল এমন কি তার স্ত্রীকেও। নারী যাদু নষ্ট করার জন্যে যখন পুনরায় যাদুকরের নিকট গমন করে তখন যাদুকরের মৃত্যু হয়ে গেছে। এরপর সেই ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়; কিন্তু যখন আমি কুলের পাতায় উপরোক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলাম তখন সে আলহামদুলিল্লাহ আরোগ্য লাভ করে ও তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে সক্ষম হয়।

১৮. বদ নজর লাগা

বদনজরের কুপ্রভাব ও কুরআন থেকে তার দলীল

কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَقَالَ يَا بَنِىَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ، وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ :

এবং (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা সবাই (শহর) কোন এক প্রবেশ পথে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করিও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব না। কেননা মূল ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ। তাঁর ওপর আমার আস্থা রয়েছে। ভরসাকারীকে ভরসা করলে তাঁর প্রতিই করতে হবে। আর যখন তারা সে ভাবেই প্রবেশ করল যেভাবে তাদের পিতা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত কোন কিছু থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। তবুও ইয়াকুব (আ)-এর অন্তরে একটি আশা ছিল যে, তিনি তা পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তিনি ইলমে (নবুয়াতের) বাহক ছিলেন। অথচ অনেক মানুষ তা জানে না। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৭-৬৮)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রা) উপরিউক্ত দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা সেই সময়ের কাহিনী যখন ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-এর ভাই বিন ইয়ামিনকে তার অন্য ভাইদের সাথে মিশরে প্রেরণ করেছিলেন। আয়াতে ইয়াকুব (আ) এ নির্দেশনার ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

কা'ব, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (রা) প্রমুখ বলেছেন যে, এমনটি তিনি বদ নজরের ভয়ে বলেছিলেন। কেননা তাঁর সন্তানরা খুবই সুন্দর সুঠাম

দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের উপর লোকদের বদনজরের আশঙ্কা করে উক্ত নির্দেশ দেন। কেননা বদনজরের ক্রিয়া বাস্তব: কিন্তু পরে তিনি এও বলেন: তবে এ ব্যবস্থা আল্লাহর তাকদীরকে প্রতিহত করতে পারবে না। তিনি যা চাবেন তাই হবে .... পরিশেষে তা তাদের জন্য বদনজর হতে প্রতিরোধক হিসেবেই আল্লাহর হুকুমে কাজ হয়েছিল ....। (তাফসীর ইবনে কাসীর : ২/৪৮৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ .

কাফিররা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শুনে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায় এবং বলে: সে তো এক পাগল।

(সূরা কলাম : আয়াত-৫১)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার প্রতি বদনজর দিবে। অর্থাৎ তারা তোমাকে হিংসার প্রতিফলন ঘটিয়ে রোগী বানিয়ে দিবে যদি আল্লাহ্ তোমার প্রতি হেফাযত না থাকে। আয়াতটি প্রমাণ বহন করে যে, বদনজরের কুপ্রভাবের বাস্তবতা রয়েছে, আল্লাহর বিধান। যেমন এ বিষয়ে হাদীসও রয়েছে।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/৪১০)

হাদীস থেকে প্রমাণ

১. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : বদ নজর সত্য। (বুখারী ১০/২১৩) অর্থাৎ এর বাস্তবতা রয়েছে, এর কুপ্রভাব লেগে থাকে।

২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْعَيْنِ فَاِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ.

তোমরা বদ নজরের ক্রিয়া (খারাপ প্রভাব) থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা তা সত্য। (ইবনে মাযাহ : ৩৫০৮)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন−

اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا.

বদ নজর (এর খারাপ প্রভাব) সত্য এমনকি যদি কোন বস্তু ত্বাকদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত। কাজেই তোমাদেরকে যখন (এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্যে) গোসল করতে বলা হয় তখন তোমরা গোসল কর।

(মুসলিম : ১৪/১৭১)

৪. আসমা বিনতে উসাইম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আরজ করেন যে, জাফরের সন্তানদের নজর লাগে আমি কি তাদের জন্যে ঝাড়-ফুঁক করব? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন−

نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَضَاءَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ.

হ্যাঁ! কোন বস্তু যদি তাক্বদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত। (তিরমিযী : ২০৫৯, আহমদ : ৬/৪৩৮)

৫. আবু যর গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন−

اِنَّ الْعَيْنَ لَتُوْلَعُ بِالرَّجُلِ بِاِذْنِ اللّٰهِ حَتّٰى يَصْعَدَ حَالِقًا فَيَتَرَدّٰى مِنْهُ.

ইমাম আহমদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম হলো, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির যখন নজর লাগে তখন এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, যেন কোন উঁচু স্থানে চড়ল অত:পর কোন নজর দ্বারা হঠাৎ করে নিচে পড়ে গেল। (শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন : ৮৮৯)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন−

اَلْعَيْنُ حَقٌّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ.

বদ নজর সত্য তা যেন মানুষকে উপর থেকে নিচে ফেলে দেয়।

(ইমাম আহমদ ও তাবরানী আলবানী হাসান বলেছেন : ১২৫০)

৭. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন-

اَلْعَيْنُ تَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَتَدْخُلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ.

বদ নজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং উটকে পাতিলে।

(সহীহ আল জামে : শাইখ আলবানী (র) সহীহ বলেছেন : ১২৪৯)

মানুষের নজর লাগায় সে মারা যায়, যার ফলে তাকে কবরে দাফন করা হয়। আর উটকে যখন বদ নজর লাগে তখন তা মৃত্যু পর্যায়ে পৌছে যায় তখন মৃত্যু শয্যায় সেটা যবাই করে পাতিলে পাকানো হয়।

৮. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন-

اَكْثَرُ مَنْ يَمُوْتُ مِنْ اُمَّتِىْ بَعْدَ قَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدَرِهٖ بِالْعَيْنِ.

আমার উম্মতের মধ্যে তাক্বদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু বদ নজর লাগার দ্বারা হবে। (বুখারী)

৯. আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আমাকে বদ নজর থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিতেন।

(বুখারী : ১০/১৭০, মুসলিম : ২১৯৫)

১০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নজর থেকে রক্ষা ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ও ক্ষত বিশিষ্ট রোগ থেকে রক্ষার জন্যে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম : ২১৯৬)

১১. উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তার ঘরে এক মেয়ে শিশুর চেহারায় দাগ দেখে তিনি বলেছেন যে, তার চেহারায় বদ নজরের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাকে ঝাড়-ফুঁক করাও। (বুখারী : ১/১৭১, মুসলিম : ৯৭)

১২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ আলে হাযমকে সাপে দংশিত ব্যক্তির ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। আর আসমা বিনতে উমাইসকে বললেন, কি ব্যাপার আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে দুর্বল দেখছি, তাদের কি কিছু হয়েছে? আসমা (রা) বললেন না, কিছু হয়নি তবে বদ নজর তাদেরকে দ্রুত লেগে যায়। নবী করীম ﷺ বললেন, তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক করাও অত:পর তাকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হলো : তিনি বলেন, তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক কর। (ইমাম মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন : ২১৯৮)

বদ নজর প্রসঙ্গে মনীষীদের মতামত

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন : বদ নজরের প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য যা আল্লাহর নির্দেশই হয়ে থাকে। (তাফসীর ইবনে কাসীর : ৪/৪১০)

ক. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন : বদনজরের মূল বিষয় হলো কোন উত্তম বস্তুকে কোন নিকৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি হিংসার চোখে দেখে। যার ফলে সেই মানুষ অথবা যে কোন প্রাণী, যে কোন ধরনের বস্তুর ক্ষতিসাধিত হয়। (ফাতহুল বারী : ১০/২০০)

খ. ইবনে আসীর (র) বলেন : অমুককে চোখ লেগেছে এটা তখন বলা হয়, যখন কারো প্রতি কোন শত্রু অথবা হিংসুক দৃষ্টিপাত করে, আর এর ফলে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। (আন-নিহায়া : ৩/৩২)

গ. হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (র) ও কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বদ নজরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন এবং তারা বলেছেন যে, এর কোন সত্যতা নেই এটা কেবল কুসংস্কার ও ভুল ধারণা। যুগ যুগের বিজ্ঞজনেরা একে অস্বীকার করেনি, যদিও তারা তার কারণ ও দিক নিয়ে মতভেদ করেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দেহ ও আত্মার বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াশীল দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এদের ভেতর অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কোন জ্ঞানী ব্যক্তির দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আত্মার প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করতে পারবে না, কেননা এটা এমন একটি বিষয় যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত ও অনুভব করতে পারি। যেমন মানুষের চেহারা লাল রং ধারণ করে যখন তার দিকে কোন লজ্জাকারী ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে। তেমনি ভাবে ভয়ের কিছু দেখলে হলদে রং ধারণ করে। আর জনগণ বাস্তবে দেখতে পেয়েছে যে, বদ নজরের জন্যে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর এসব আত্মার প্রভাবে হয়ে থাকে। আর যেহেতু আত্মার সম্পর্ক চোখের সাথে খুবই গভীর এজন্য এটাকে চোখ লাগা বলা হয়। কিন্তু চোখের নিজস্ব এমন কোন প্রভাব নেই বরং প্রতিক্রিয়া কেবল আত্মার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর আত্মার ক্ষমতা, প্রকৃতি ও এর গুণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কাজেই হিংসুক থেকে হিংসার মাধ্যমে হিংসাকৃত্যের উপর স্পষ্ট কষ্টের প্রভাব পড়ে।

এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন হিংসাকারীদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

বদনজর কখনও যোগাযোগ হয় আর কখনও মুখোমুখি হয় কখনও দৃষ্টিপাতে, আবার কখনও আত্মার দ্বারা ঘায়েল করে আর কখনও এর প্রভাব বদ দুআ ও তাবীজের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর কখনও ধ্যানের মাধ্যমে হয়।

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ নজর কেবল দৃষ্টির দ্বারা হয় না বরং কখনও অন্ধ ব্যক্তিরও বদ নজর লাগে আর তা এভাবে যে, তার সামনে কারো প্রশংসা বর্ণনা করা হয় আর তা শ্রবণ করে অন্ধ ব্যক্তির আত্মা সেই প্রশংসিত ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এটা একটা বিষাক্ত তীরের ন্যায় যা বদ নজরকারী ব্যক্তির আত্মা তাকে বের হয়ে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত হানে। আর এই তীরের লক্ষ্য বস্তু কখনও সঠিক হয় আবার কখনও হয় না। এর একটি দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন আক্রমণকারী এমন ব্যক্তির ওপর যদি আক্রমণ করে, যার গায়ে সুরক্ষিত যুদ্ধ পোশাক থাকে তবে আঘাতে তার শরীর আহত হবে না। তেমনি যদি দু'আ পড়ে সে যদি সুরক্ষিত থাকে তবে হবে। আর কখনও এমন হয় যে, তীর ব্যবহারকারীর তীর শত্রুর উপর আঘাত না হেনে বরং তীর ব্যবহারকারীর দেহকেই উল্টো আঘাত করে বসে। তেমিনভাবে কখনও বদ নজর যে লাগায় উল্টো তার উপর আঘাত হানতে পারে। আর কখনও বা অনিচ্ছায় বদ নজর লেগে যায়।

অতএব এর প্রকৃতি হলো বদ নজরকারীর আশ্চার্য হয়ে চোখ লাগানো এরপর তার খবীস আত্মা তার অনুসরণ করে যা তার বিষাক্ত দৃষ্টিকে সহযোগিতা করে। কখনও মানুষ নিজেকেই বদনজরে মেরে থাকে, কখনও তার ইচ্ছার বাইরেও বদনজর লেগে থাকে। (যাদুল মা'আদ থেকে সংক্ষিপ্তকারে : ১/১৬৫)

বদ নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য

১. প্রত্যেক বদ নজরওয়ালা হিংসুক, কিন্তু প্রত্যেক হিংসুক বদ নজরওয়ালা নয়। এজন্য সূরা ফালাকে হিংসাকারীর ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। যাতে হিংসুকের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করার ফলে সে বদনজর থেকেও রক্ষা পায়। আর এটিই হলো কুরআনের ব্যাপকতা এবং তার মোজেযা ও অলংকারিত্ব।

২. হিংসার মূল বিষয় হলো বিদ্বেষ এবং অপরের নেয়ামত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বদ নজরের মূল বিষয় হলো অন্যের কোন কিছুকে খুব ভালো মনে করা।

৩. হিংসার প্রভাব ভবিষ্যতের কোন ভালো জিনিসের ওপরও হয়ে থাকে আর বদ নজরের প্রভাব বর্তমান উপস্থিত বিষয়ের উপর হয়ে থাকে।
৪. কোন ব্যক্তি নিজেকে এবং নিজের সম্পদকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে না, তবে তার নিজের সম্পদগুলো ও দেহে নিজের বদনজর লেগে যেতে পারে।
৫. হিংসা এবং বদ নজরের পরিণাম একই যার ফলে উভয়ই ক্ষতি-সাধনের কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু উভয়ের উৎসের পার্থক্য রয়েছে : হিংসার উৎস অন্তরের জ্বলন সৃষ্টি হওয়া এবং সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর বদ নজরের উৎস চোখের দৃষ্টি শক্তির খারাপ প্রভাব এজন্য নজর দ্বারা এমন সব জিনিসও প্রভাবিত হয়, যার ওপর হিংসার ক্ষেত্র নেই যেমন জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদসমূহ এবং চাষাবাদ ও সম্পদ। আর কখনও নিজের নজর নিজেতেই লেগে যায়। কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তুকে আশ্চর্যের সাথে এবং গভীর দৃষ্টিতে দেখে এবং সাথে সাথে তার আত্মা ও অন্তর এক ধরনের চাঞ্চল্যের অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন তা দ্বারা বদ নজর লেগে থাকে।
৬. হিংসা নিকৃষ্ট হৃদয়ের মানুষ থেকেই হয়। প্রকারান্তরে বদ নজর নেক ব্যক্তির দ্বারাও হয়ে থাকে। যখন সে কোন বস্তুকে অধিক পছন্দ করে ফেলে অথচ সে সেটার ধ্বংস চায় না। এর দৃষ্টান্ত আমের ইবনে রাবীয়ার ঘটনা যখন সাহাল ইবনে হুনাইফকে তার নজর লেগে যায় অথচ আমের (রা.) প্রথম যুগের মুসলমান ও আহলে বদরের অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য যারা বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : ইবনে জাওযী, ইবনে কাইয়্যিম, ইবনে হাজার আসকালানী, নববী (র) ও প্রমুখ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি দয়া ও রহমত করুন।

মুসলমানদের উচিত যখন কোন কিছু দেখে পছন্দ হয়ে যায়; তখন বরকতের দু'আ করা, সেই বস্তু নিজের হোক অথবা অন্যের। কেননা নবী করীম করীম ﷺ আমেরকে বলেছিলেন, তুমি তার জন্যে (সাহাল ইবনে হুনাইফের জন্যে) বরকতের দু'আ করনি? কেননা এ দু'আ বদ নজর থেকে সুরক্ষা হয়ে থাকে।

জ্বীনের বদ নজর মানুষকে লাগতে পারে

১. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ জ্বীনের নজর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং এরপর মানুষের বদ নজর থেকেও আশ্রয় চাইতেন। সুতরাং যখন সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হলো তখন অন্য দু'আ ছেড়ে দিয়ে এ সূরাদ্বয় দিয়ে প্রার্থনা করতেন।
(ইমাম তিরমিযী চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন : ২০৫৯, ইবনে মাযাহ : ৩৫১১, আর আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন।)

২. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তার ঘরে একটি বালিকা দেখলেন, যার চেহারায় জ্বীনের বদনজরের কালো দাগ। তা দেখে তিনি বলেন : ঝাড়-ফুঁক কর কেননা তাকে জ্বীনের বদনজর লেগেছে।" (বুখারী : ২০১০/১৭১ ও মুসলিম : ২১৯৭)

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় হতে বুঝা যায়, মানুষ থেকে যেমন বদনজর লাগে অনুরূপ জ্বীন হতেও লাগে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সে যখন পোশাক খুলবে, আয়না দেখবে বা সে যে কর্ম করবে তখন যেন দু'আ যিকির পড়ে যাতে সে নিজের, মানুষের ও জ্বীনের বদনজর বা অন্য কোন কষ্ট থেকে নিরাপদ বা সংরক্ষিত থাকতে পারে।

বদ নজরের চিকিৎসা

বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা রয়েছে

প্রথম পদ্ধতি : যে ব্যক্তি নজর লাগিয়েছে যদি তার সম্পর্কে জানা যায় তবে তার গোসল করা পানি নিয়ে রোগীর পিঠে ঢেলে দিবে। তাতে আল্লাহ তায়ালার কৃপায় সে আরোগ্য লাভ করবে।

আবূ উমামা ইবনে সাহাল ইবনে হুনাইফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমার পিতা সাহাল ইবনে হুনাইফ মদীনার খায়বার নাম উপত্যকায় গোসল করার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। যখন তিনি গোসলের জন্যে জামা খুললেন তখন তার দেহে আমের ইবনে রাবীয়া (রা.) এর দৃষ্টি পড়ে যেহেতু সাহল ইবনে হুনাইফ সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন, তাই আমের দেখামাত্র বলে উঠল। আজকের মতো এমন (সুন্দর) চামড়া আমি কখনও দেখিনি; এমন কি অন্দর মহলের কুমারীদেরও না। তার একথা বলার সাথে সাথে সাহাল তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং প্রচণ্ড আকারে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এরপর নবী করীম ﷺ কে বিষয়টি জানানো হয় এবং বলা হলো যে, সে তার মাথা উঠাতে পারছে না।

নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি কারো প্রতি নজরের সন্দেহ কর? জবাবে লোকজন বলল, হ্যাঁ আমের ইবনে রাবীয়ার উপর সন্দেহ হয়। এটা শুনে নবী করীম ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, কেন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের ভাইকে হত্যা করে। তুমি তার জন্যে বরকতের দু'আ কেন করনি? এখন তার জন্যে গোসল কর। অত:পর আমের নিজের হাত, চেহারা, দু'পা, দু'হাটু, দু'কনুই ও লুঙ্গীর আভ্যন্তরীণ অংশ একটি পাত্রে ধৌত করলেন। অত:পর সেই পানি সাহাল ইবনে হুনাইফের পিঠে ঢেলে দেয়া হলো। এরপর সাথে সাথে আরোগ্য হলো (এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন আর আলবানী (র) সহীহ বলেছেন।)

লুঙ্গীর আভ্যন্তরীণ অংশ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, তা দ্বারা দেহের অংশ বুঝানো হয়েছে। আর কেউ এটাও বলেছেন যে, এর অর্থ লজ্জাস্থান। এটাও বলা হয়েছে যে, কোমর কাজী ইবনুল আরবি বলেন এর দ্বারা লুঙ্গীর নিম্নের সংশ্লিষ্ট বুঝানো হয়েছে।

বদ নজরের গোসলের পদ্ধতি

আল্লামা ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, গোসলের পদ্ধতি যা আমরা আমাদের উলামাদের নিকট থেকে শিখেছি তা হলো : যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে নজর লেগেছে তার সামনে এক পাত্র পানি দেয়া হবে। এরপর সেই ব্যক্তি পানি নিয়ে পাত্রে কুলি করবে। এরপর পাত্রে নিজের মুখ ধৌত করবে। বাম হাতে ঢেলে ডান হাতের কব্জি ও ডান হাতে ঢেলে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার করে ধৌত করবে, তারপর বাম হাত দিয়ে ডান কুনুই এবং ডান হাতে বাম পায়ে ঢালবে। এরপর বাম হাতে ডান পায়ের হাঁটু আর ডান হাতে বাম পায়ের হাঁটুতে ঢালবে। আর সব যেন পাত্রে হয়। এরপর লুঙ্গী বা পায়জামার ভেতরের অংশ পাত্রে ধৌত করবে নিচে রাখবে না। অত:পর সকল পানি রোগীর মাথায় একবারে ঢালবে।

(ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরা : ৯/২৫২)

এ গোসলের বিধিবদ্ধতার প্রমাণ

১. নবী করীম ﷺ বলেছেন : নজর লাগা সত্য, আর কোন কিছু যদি তাক্বদীরকে অতিক্রম করত তবে তা বদ নজর হতো। আর তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন (এর জন্য) গোসল করতে বলা হয় তখন সে যেন গোসল করে। (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন : ৫/৩২)

২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর যুগে। নজর যে ব্যক্তি লাগিয়েছে তাকে ওযূ করতে বলা হতো। আর সেই ওযূ করা পানি দিয়ে নজর লাগা ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হতো।" (আবূ দাউদ : ৩৮৮০ সহীহ সূত্র)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা নজরকৃত ব্যক্তির জন্য বদ নজরকারীর ওযূ ও গোসল সাব্যস্ত হয়।

চিকিৎসার দ্বিতীয় পদ্ধতি

রোগীর মাথায় হাত রেখে নিম্নের দু'আ পড়া–

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ.

আল্লাহর নামে তোমায় ঝাড়-ফুঁক করছি। আর আল্লাহই তোমাকে কষ্টদায়ক রোগ থেকে নাজাত দিবেন। আর সকলের ক্ষতি ও হিংসুক বদ নজরকারীর ক্ষতি থেকে তোমাকে আরোগ্য দিবেন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ছি।

(মুসলিম : ২১৮৬)

তৃতীয় পদ্ধতি

রোগীর মাথায় হাত রেখে এ দু'আ পাঠ করুন–

بِسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيْكَ، مِنْ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمَنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا اَحَسَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ عَيْنٍ -

আল্লাহর নামে ঝাড়ছি, তিনি তোমাকে মুক্ত করবেন এবং তিনিই প্রত্যেক রোগ থেকে তোমাকে আরোগী দিবেন এবং হিংসাকারীর হিংসার ক্ষতি থেকে যখন সে হিংসা করে এবং সকল বদ নজরের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুক।

(মুসলিম : ২১৮৬)

রোগীর মাথায় হাত রেখে এ দু'আ পাঠ করুন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاْسَ، وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

হে আল্লাহ! মানবজাতির রব তার কষ্ট দূর করে দাও এবং তাকে আরোগ্য করে দাও। কেবল তুমিই রোগমুক্তির মালিক তোমার চিকিৎসা ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই, তুমি এমন সুস্থ করে দাও যেন কোন রোগ না থাকে।

(বুখারী কিতাবুত তিব্ব)

পঞ্চম পদ্ধতি

বদনজরের রোগীর ব্যথার স্থানে হাত রেখে নিম্নের সূরাগুলো পাঠ করে ঝাড়বে : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ -

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، اِلٰهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

বদ নজরের চিকিৎসার কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত

প্রথম দৃষ্টান্ত : সন্তান মায়ের স্তনে মুখে দেয় না

আমি এক স্থানে আমার আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতে গেলাম। তারা আমাকে এক শিশুর বিষয়ে জানাল যে, কিছু দিন হলো সে তার মায়ের দুধ পান করা ছেড়ে দিয়েছে, অথচ কিছুদিন আগেই সে তার মায়ের দুধ স্বাভাবিকভাবে পান করত। আমি তাদেরকে বললাম শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তারা শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসলে আমি কতিপয় মাসনূন দু'আ এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলাম এবং আমি বললাম এবার শিশুটিকে তার মায়ের নিকট নিয়ে যান। শিশুটিকে মায়ের নিকট নিয়ে গেল এবং ফিরে এসে আমাকে সুসংবাদ দিল যে, শিশুটি এখন মার স্তনে মুখে দিয়ে দুধ পান করছে। আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্পূর্ণই আল্লাহর মেহেরবাণী। এতে তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয় ঘটনা : বালকের বাকশক্তি রুদ্ধ

একটি বালক কথা বলা বন্ধ করে দেয় : সে মাধ্যমিক মডেল স্কুলের অত্যন্ত মেধাবী ও মিষ্টভাষী শিশু যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখত। একদিন তার গ্রামে কারো মৃত্যুতে শোকাহত ব্যক্তিদের সান্ত্বনার জন্যে গেল। সেখানে হামদ ও সানা পড়ার পর সে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য দেয়। এরপর যখন সে বাড়ি ফিরে সে রাতেই বোবা হয়ে গেল। তার বাবা তাকে হাসপাতাল নিয়ে গেল। ডাক্তারগণ চেকআপ করে কিছুই পেল না। এরপর তার বাবা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসলে আমি তাকে দেখে আশ্চর্য হলাম, আমার চোখে পানি এসে গেল। কেননা আমি তার বিষয়ে জানতাম।

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তার বাবার কাছে ঘটনা জানতে চাইলে তিনি আমাকে সব বললেন, আর বালকটি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ছেলেটির ওপর বদ নজর পড়েছে। আমি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তার উপর ঝাড়-ফুঁক করলাম এবং বদ নজরের দু'আগুলো ও আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে তার বাবাকে দিয়ে বললাম এ পানি সাতদিন পর্যন্ত ছেলেটিকে পান করাবেন এবং তা দিয়ে গোসল করবেন। এরপর আমার নিকট নিয়ে আসবেন।

যখন সাতদিন পর সন্তানটি আমার কাছে আসল তখন সে আলহামদুলিল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থ এবং পূর্বের ন্যায় কথা বলতে থাকে। এরপর আমি তাকে বদ নজর থেকে সংরক্ষণের জন্যে সকাল-সন্ধ্যার দু'আগুলো শিখিয়ে দিলাম। (রোগী সম্মানিত লিখকের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সরাসরি ছাত্র। সৌদি আরবের আবহাতে শিক্ষকতা অবস্থায় তিনি তাকে পড়ান)

তৃতীয় উদাহরণ

এ কাহিনীটি আমার নিজের বাড়ির–

সংক্ষেপে কাহিনীটি হলো, এক ব্যক্তি এবং এক বৃদ্ধ নারী আমাদের নিকট আগমন করলেন। মহিলা আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসলেন আর পুরুষটি আমার কাছে এসে বসল এবং তার মায়ের কাহিনী বলতে লাগল। এরপর আমি তার মাকে আমার নিকট ডাকলাম এবং কিছু দু'আ পড়ে তাকে ঝাড়লাম। এরপর তারা চলে গেল।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পর দেখি যে, ছোট ছোট সাদা সাদা পোকা ঘরের সব স্থানে ছেয়ে গেছে। আমি চিন্তা করলাম এসব পোকা কোথা থেকে আসল। আমি হতাশায় পড়ে গেলাম। আমার স্ত্রী অনেকবার ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকল কিন্তু মুহূর্তেই আবার ঘর পূর্ণ হয়ে যায়। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম ভেবে দেখ এমনটি কেন হচ্ছে? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই বৃদ্ধ মহিলা তোমাকে কি বলছিল? জবাবে সে বলল : যে বৃদ্ধা আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে শুধু লম্বা লম্বা দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিল; কিন্তু কোন কিছু বলছিল না। আমি বুঝে গেলাম যে, এসব বদ নজরের জন্যেই হয়েছে। যদিও আমাদের বাড়ি খুবই সাধারণ ও সাদা সিধে। হয়ত বৃদ্ধ নারী কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিল, যে শহর কখনও দেখেনি।

মূলকথা হলো যে, আমি একপাত্র পানি নিয়ে বদনজর নষ্টের জন্যে দু'আ পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিলাম। আর সমস্ত পানি ঘরে ছিটিয়ে দিলাম। এরপর মুহূর্তেই সমস্ত পোকা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর বাড়ির সকল স্থান আগের অবস্থায় ফিরে আসল। আলহামদুলিল্লাহ।

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com

ISBN 978-984-8885-19-2